বাঙলার কয়েকটি কিংবদন্তী

অরবিন্দ গুহ

চয়নিকা
৪৭ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
দেবাশিস মজুমদার
৪৭ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ, ১৩৭১

প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর ঃ
চয়নিকা
শুভাশিস মজুমদার
৪৭ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

শ্রীশঙ্খ ঘোষ

সুহৃদবরেষু

অতীশের ভিটে ৯
জয়দেব কেঁদুলী ২৮
জলালুদ্দীন ৪১
গোপীনাথ ৪৯
ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি ৫৮
কালাপাহাড় ৬৪
বউঠাকুরানীর হাট ৭২
মহামূল্যবান রত্ন ৮৩
গুরুমা ১০১
গোস্বামী দুর্গাপুর ১০৭

অতীশের ভিটে

সম্ভবত ৯৮২ সালে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে চন্দ্রগর্ভের জন্ম। চন্দ্রগর্ভের বাবার নাম কল্যাণশ্রী, মায়ের নাম প্রভাবতী। চন্দ্রগর্ভ মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান। চন্দ্রগর্ভ একজন রাজপুত্র।

বজ্রযোগিনী গ্রামে চন্দ্রগর্ভের ভিটে।

খুব অল্প বয়সেই চন্দ্রগর্ভকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য মা-বাবা পাঠালেন অবধূত জেগরির কাছে। তাঁর কাছে চন্দ্রগর্ভ পঞ্চবিজ্ঞান শিখেছেন।

তারপর অবধূত জেগরি একদিন চন্দ্রগর্ভকে বললেন—তুমি এবার নালন্দায় যাও।

বিদ্যাচর্চার জন্য নালন্দার খ্যাতি অনেকদিন আগেই দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়েছে। নালন্দায় অজস্র বিষয়ে শিক্ষার বিচিত্র ও বিপুল ব্যবস্থা। পালযুগে রাজারা হাতে নালন্দাকে সাহায্য করেছেন—নালন্দার তখন চূড়ান্ত খ্যাতি ও সমৃদ্ধি।

অবধূত জেগরির কথামতো চন্দ্রগর্ভ চলে এলেন নালন্দায়, দেখা করলেন আচার্য বোধিভদ্রের সঙ্গে। আচার্য বোধিভদ্র শ্রমণরূপে বরণ করে নিলেন চন্দ্রগর্ভকে; নতুন নাম দিলেন—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ৯৯৪ সালের কথা।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে আচার্য বোধিভদ্র এলেন রাজগৃহে। ৯৯৪ সাল থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজগৃহে আচার্য অদ্বয়বজ্রের কাছে নানা রকম শাস্ত্র পড়েছেন। এখানে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আরও কয়েকজন আচার্যের নাম লিখে রাখা ভালো— রাহুলগুপ্ত, শীলরক্ষিত, ধর্মকীর্তি, শান্তি-পা, নারো-পা, অবধূতি-পা।

রাজগৃহের পর বিক্রমশীল মহাবিহার। রাজা ধর্মপাল রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন; এই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিক্রমশীল মহাবিহার। বিক্রমশীলের খ্যাতি একদা নালন্দার খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিক্রমশীল মহাবিহারে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তন্ত্রশাস্ত্র শিখেছেন ১০১১ সাল পর্যন্ত। তারপর তিনি গেলেন বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া)। সেখানে মহাবিনয়ধর শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি ভিক্ষু হয়েছেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বয়স তখন উনত্রিশ বছর।

সুমাত্রা, যবদ্বীপ ইত্যাদি পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ নাম ছিল সুবর্ণদ্বীপ। আমাদের দেশ থেকে সমুদ্র ছাড়া সুবর্ণদ্বীপে যাওয়ার অন্য কোনও পথ ছিল না। ১০১৩ সালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমুদ্রপথে রওনা হলেন সুবর্ণদ্বীপের দিকে। সমুদ্রপথে চোদ্দ-পনর মাস কেটেছে।

সমগ্র বৌদ্ধজগতে তখন সুবর্ণদ্বীপের আচার্য ধর্মকীর্তির অসামান্য খ্যাতি। সেখানে তাঁর কাছে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বারো বছর বিস্তর পড়াশোনা করেছেন।

তারপর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুবর্ণদ্বীপ থেকে ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে। ফেরার পথে তিনি ঘুরে এসেছেন রত্নদ্বীপ এবং আরও কয়েকটি দেশ।

সুবর্ণদ্বীপ থেকে ফিরে আসার পর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কিছুকাল

থেকেছেন বজ্রাসনের মহাবোধি বিহারে। তারপর মগধের রাজা নয়পালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ হয়েছেন।

বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ বটে, কিন্তু আরও অন্তত তিনটি মহাবিহারের সঙ্গে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—নালন্দা মহাবিহার, ওদন্তপুরী মহাবিহার, সোমপুরী মহাবিহার।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ তখন একজন রাজা মগধ আক্রমণ করেছেন। প্রথমে মগধের রাজা নয়পালের সৈন্য-বাহিনী পরাস্ত হয়েছে, শত্রুপক্ষ মগধের রাজধানী পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত রাজা নয়পাল জয়ী হয়েছেন। পরাস্ত শত্রুপক্ষ শান্তির আবেদন করেছে। আবেদন ব্যর্থ হয়নি, শান্তি স্থাপিত হয়েছে, দুই রাজ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে। এই শান্তি স্থাপনে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বিক্রমশীল মহাবিহারের অধ্যক্ষ সম্ভবত তখনই তাঁব নামের আগে আরেকটি শব্দ যুক্ত হয়েছে—অতীশ। অতঃপর পুরো নাম হল—অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

বজ্রযোগিনী গ্রামের চন্দ্রগর্ভ হয়ে গেলেন বিক্রমশীল মহাবিহারের অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

বিক্রমশীল মহাবিহারে একদিন দেখা গেল ঠিকমতো ভিক্ষা না পেয়ে একটি ভিক্ষুক অতীশ দীপঙ্করের পিছনে ছুটতে-ছুটতে বলতে লাগল—ভালা হো, ও নাথ অতীশ, ভাত-ওনা, ভাত-ওনা (হে নাথ অতীশ, তোমার কল্যাণ হোক, আমাকে ভাত দাও)।

'অতীশ' মানে 'মহাপ্রভু'।

বিক্রমশীল মহাবিহারের সামনের দেয়ালের বাঁদিকে একদা অঙ্কিত হয়েছে অতীশ দীপঙ্করের মূর্তি।

অতীশ দীপঙ্করের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুদূর তিব্বতের রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের দূত হয়ে দুর্গম পথ

পাড়ি দিয়ে বীর্যসিংহ নামে একজন তিব্বতী একদিন বিক্রমশীল মহাবিহারে এলেন অতীশ দীপঙ্করের কাছে।

অতীশ দীপঙ্করের জন্য বীর্যসিংহের সঙ্গে বিস্তর দামী উপহার পাঠিয়েছেন রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ। তিব্বতে যাওয়ার জন্য তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন অতীশ দীপঙ্করকে।

বীর্যসিংহের মুখে সব কথা শুনে অতীশ দীপঙ্কর বললেন—সোনার লোভে মানুষ তিব্বতে যেতে পারে। কিন্তু সোনা দিয়ে আমি কী করব? আমার সোনার দরকার নেই।

বীর্যসিংহ সবিনয়ে বললেন— আপনি আমাদের দয়া করুন।

অতীশ দীপঙ্কব বললেন—সোনার লোভ না থাকলেও যাঁর বিলিয়ে দেওয়ার মতো অপার দয়াদাক্ষিণ্য আছে তাঁর পক্ষে তিব্বতে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমার অত দয়াদাক্ষিণ্য নেই।

বীর্যসিংহ ব্যাকুল হয়ে বললেন—আপনি আমাদের দয়া করুন।

কিন্তু অতীশ দীপঙ্কর কিছুতেই তিব্বতে যেতে রাজী হলেন না।

হতাশ হয়ে বীর্যসিংহ তিব্বতে ফিরে গেলেন।

এখানে বলে রাখা ভালো—বীর্যসিংহ পরে আবার ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন, বিক্রমশীল মহাবিহারে শিক্ষার্থী হয়েছেন।

অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে এলেন না। চেষ্টা ব্যর্থ হল। কিন্তু তিব্বতের রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ হাল ছেড়ে দিলেন না। অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে আসার জন্য আবার চেষ্টা করতে হবে। আবার চেষ্টা করতে হলে আরও অনেক সোনা যোগাড় করা দরকার। রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ সোনা যোগাড় করতে লাগলেন।

খবর পাওয়া গেল নেপাল সীমান্তে একটা সোনার খনি আছে। আরও সোনা যোগাড় করার জন্য রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ সেখানে উপস্থিত হলেন।

পাশের রাজ্যের একজন বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজার সৈন্যেরা সুযোগ পেয়ে

রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভকে বন্দী করে নিয়ে গেল। একটি অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী হয়ে রইলেন তিনি।

রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের মুক্তির জন্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বোধিপ্রভ গিয়ে উপস্থিত হলেন বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজার কাছে। কী হলে তিনি মুক্তি দেবেন?

একটি শর্তে মুক্তি পাওয়া যাবে। যদি রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেন এবং···

এ-শর্ত মেনে নেওয়া অসম্ভব। প্রাণ গেলেও রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ বৌদ্ধধর্ম ছাড়বেন না। আর কোনও শর্তে মুক্তি পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ, আরেকটি শর্তে মুক্তি পাওয়া যাবে। রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের একখানা হুবহু মূর্তি গড়বার মতো সোনা যদি পাওয়া যায় বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা তাহলে মুক্তি দিতে রাজী আছেন।

এই শর্ত মেনে নিলেন বোধিপ্রভ। অঢেল সোনা যোগাড় করতে লাগলেন।

বিস্তর সোনা যোগাড় করে বোধিপ্রভ এলেন বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজার কাছে। সোনা গলানো হল, ঢালাই করা হল। বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা দেখেশুনে বোধিপ্রভকে বললেন—এ-সোনায় রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের গলা থেকে পা পর্যন্ত মূর্তি বানানো যাবে বটে, কিন্তু তাঁর মস্তক বানানো যাবে না। সোনা কম পড়ে যাবে। অতএব এখন কী করে মুক্তি দেব? সব সোনা ফেরত নিয়ে যান। আরও সোনা নিয়ে আসুন।

বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজার হুকুমে আরও অন্ধকার একটি কারাকক্ষে বন্দী হয়ে রইলেন রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ।

কিন্তু বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজার অসীম দয়া। তিনি কিছুক্ষণের জন্য বোধিপ্রভকে কারাকক্ষে গিয়ে রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের সঙ্গে দেখা

করার অনুমতি দিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে সব শুনে রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ বললেন—আমার মুক্তি দিয়ে কী হবে? কদিন আর বাঁচব? এই নিষ্ঠুর রাজাকে সোনার একটি কণাও দিও না। সব সোনা তুমি নিয়ে যাও, অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে আসার জন্য সব সোনা খরচ করো। আমার মুক্তি দিয়ে কী হবে? তার চেয়ে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে এলে তিব্বতের ঢের বেশি উপকার হবে। আর অতীশ দীপঙ্কর যদি নিতান্তই না আসেন তো তিনি যেন দয়া করে তাঁর পছন্দ মতো কোন পণ্ডিতকে তিব্বতে পাঠান।

অন্ধকার কারাকক্ষে কী দারুণ কষ্টের মধ্যে আছেন রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভ।

বোধিপ্রভের তো সেখানে বেশিক্ষণ থাকার অনুমতি নেই, তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন কারাকক্ষ থেকে। কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে যেতে-যেতে বোধিপ্রভ গরাদের ফাঁক দিয়ে বারংবার তাকাতে লাগলেন রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের দিকে।

রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের মুক্তির জন্য বোধিপ্রভ আরও সোনা যোগাড় করতে লাগলেন।

কিন্তু সোনার বদলে মুক্তির দরকার হল না। অন্ধকার কারাকক্ষে ধর্মপ্রাণ রাজা জ্ঞানপ্রভ শেষ নিশ্বাস ফেললেন।

তারপর বোধিপ্রভ তিব্বতের রাজা হলেন।

রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য রাজা বোধিপ্রভ তিব্বত থেকে পাঠালেন জয়শীলকে।

জয়শীল আর তাঁর সঙ্গীরা তিব্বত থেকে এসে বিক্রমশীল মহাবিহারে যখন পৌঁছলেন তখন রাত্রি। তিব্বতী ভাষায় প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন তাঁরা। বীর্যসিংহ তখন বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রবেশকক্ষের উপরে ছাদে বসেছিলেন। তিব্বতী ভাষায় প্রার্থনামন্ত্র

শুনে বীর্যসিংহ চেঁচিয়ে বললেন--তোমরা কি তিব্বতের মানুষ ? কাল তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

দেখা হয়েছে। বীর্যসিংহ পরদিনই জয়শীলকে নিয়ে গিয়েছেন অতীশ দীপঙ্করের কাছে।

জয়শীলের মুখে অতীশ দীপঙ্কর শুনলেন তিব্বতের রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের শেষ জীবনের ইতিহাস।

অতীশ দীপঙ্কর বললেন– লোকান্তরিত রাজা দেবগুরু জ্ঞানপ্রভের কাছে আমি লজ্জিত। সবদিক বিবেচনা করে এখন আমি সাব্যস্ত করলাম যে আমি তিব্বত যাব। কিন্তু বিক্রমশীল মহাবিহারের স্থবির আমাকে সহজে যেতে দেবেন না—এই এক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। তুমি যে আমাকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে এসেছ—কেউ যেন জানতে না পারে। তুমি শিক্ষালাভের জন্য এদেশে এসেছ, একথা প্রচার করে এখানে অধ্যয়নে মন দাও।

অতীশ দীপঙ্করের জন্যে তিব্বত থেকে বিস্তর সোনা নিয়ে এসেছেন জয়শীল। আরেকদিন জয়শীল এসে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করলেন অতীশ দীপঙ্করকে, সব সোনা রাখলেন তাঁর পায়ের কাছে। অতীশ দীপঙ্কর বললেন—আমি একশ-আটটি মন্দিরের অধ্যক্ষ, প্রত্যহ আমাকে বিস্তর সঙ্ঘের কাজ করতে হয়। সেসব কাজের ভার থেকে মুক্ত হতে আমার কমপক্ষে দেড়বছর সময় লাগবে। তার আগে আমি কিছুতেই তিব্বত যেতে পারব না। এখন সব সোনা তোমার কাছে রেখে দাও।

অতীশ দীপঙ্করের কথা মতো কাজ করতে লাগলেন জয়শীল।

বীর্যসিংহ একদিন জয়শীলকে বললেন—এই মহাবিহারের স্থবির রত্নাকর সবচেয়ে প্রভাবশালী, সঙ্ঘারামের তিনি সর্বাধ্যক্ষ। তুমি তাঁর শিষ্য হও। তোমার অধ্যয়নে ও আচরণে তাঁকে তুষ্ট করো। তুমি যে অতীশ দীপঙ্করকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছ, একথা এখন গোপন

রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। বহু পণ্ডিত গ্রহনক্ষত্রের মতো অতীশ দীপঙ্করের চতুর্দিকে আছেন, কিন্তু তিব্বতে তাঁরা কিছু করতে পারবেন না। সাধু ও সুপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করকে যদি আমরা তিব্বতে নিয়ে যেতে পারি তাহলে কাজের মতো কাজ হবে।

কাজের মতো কাজ আপাতত হওয়ার কথা নয়। আপাতত জয়শীল বিক্রমশীল মহাবিহারে একজন শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন।

বিক্রমশীল মহাবিহারের স্থবির রাজী হবেন না—এই আশঙ্কায় অতীশ দীপঙ্কর তাঁর তিব্বত যাত্রার কথা সযত্নে গোপন রেখেছেন।

তিব্বত যাত্রার আয়োজন গোপনে যখন প্রায় সম্পূর্ণ তখন অতীশ দীপঙ্কর একদিন সকালবেলা স্থবির রত্নাকরের কাছে গেলেন। বললেন—হে শ্রদ্ধেয়, তিব্বতের এই আয়ুস্মানদের ভারতবর্ষের পবিত্র মহাতীর্থ-গুলি দর্শন করানো দরকার।

স্থবির রত্নাকর সায় দিয়ে বললেন - আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। তীর্থদর্শন করে আমিও আপনাদের সঙ্গে ফিরে আসব।

তীর্থদর্শন করে স্থবির রত্নাকর সকলের সঙ্গে বিক্রমশীল মহাবিহারে ফিরে এলেন।

অতীশ দীপঙ্কর তারপর একদিন স্থবির রত্নাকরকে বললেন—এবার আমি তিব্বতের আয়ুস্মানদের নিয়ে নেপালে স্বয়ম্ভুচৈত্যে যাব বলে ভেবেছি।

স্থবির রত্নাকর নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছেন যে অতীশ দীপঙ্কর আসলে নেপাল হয়ে তিব্বতে চলে যাওয়ার জন্য গোপনে উদ্যোগ করেছেন।

স্থবির রত্নাকর স্পষ্টাক্ষরে জয়শীলকে বললেন—আমার ধারণা ছিল যে এখানে তুমি অধ্যয়নের জন্যই এসেছ। কিন্তু কার্যত তুমি আমাদের পণ্ডিতকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছ আর পণ্ডিতও যেন তাতে বেশ খুশিই হয়েছেন। তাঁকে আমি বাধা দেব না। কিন্তু তিন বছরের

বেশি যেন তিনি তিব্বতে না থাকেন। তারপর পণ্ডিতকে অবশ্যই ভারতবর্ষে ফিরিয়ে দিতে হবে।

অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে যাচ্ছেন। যাত্রার পরিকল্পনা করেছেন জয়শীল। কথা অগত্যা জয়শীলকেই শুনতে হয়।

বিক্রমশীল মহাবিহারের একজন তরুণ ভিক্ষু একদিন জয়শীলকে বললেন—গুরু অতীশ দীপঙ্কর আমাদের চোখের মণির মতো। তিনি তিব্বত চলে গেলে আমরা অন্ধ হয়ে যাব। আপনাদের এই মতলবের কথা যদি আমাদের রাজাকে জানিয়ে দিই তাহলে আপনাদের সমূহ বিপদ, আপনাদের প্রাণের ভয় আছে। কিন্তু আমি রাজাকে কিছু জানাব না। দেখবেন যে, পথে আমাদের গুরুর কোনও কষ্ট না হয়। আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে আবার কিন্তু আমাদের গুরুকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

অতীশ দীপঙ্করের জন্য তিব্বত থেকে বিস্তর সোনা নিয়ে আসা হয়েছে। সেসব সোনার একটি তিলও অতীশ দীপঙ্কর নিজের জন্য নিলেন না। সকল সোনা চারভাগে ভাগ করে তিনি নানা কাজের জন্য দান করে দিলেন।

তারপর অতীশ দীপঙ্কর রওনা হলেন। বজ্রাসনে এলেন। সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বাঙলা ভাষায় একটি কবিতা লিখলেন।

যেতে-যেতে পথে ভারতবর্ষের শেষ গ্রামে তাঁর চোখে পড়ল তিন অসহায় কুকুরছানা। তিনি ওদের ফেলে যেতে পারলেন না; নিজের চীবরে ঢেকে নিয়ে চললেন। লোকে বলে ওসব কুকুরছানার বংশধরদের এখনও তিব্বতের দাঁই অঞ্চলে দেখা যায়।

নেপালে পা দিলেন অতীশ দীপঙ্কর। অল্পদিনের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন নেপালের রাজধানীতে। নেপালের রাজা তখন অনন্তকীর্তি। তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন অতীশ দীপঙ্করকে। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে অতীশ দীপঙ্কর নেপালে এক বছর থেকে গেলেন।

নেপাল থেকে অতীশ দীপঙ্কর তাঁর প্রিয় শিষ্য রাজা নয়পালের উদ্দেশে 'বিমল-রত্নলেখ-নাম' দিয়ে একটা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানায় তিনি নয়পালকে বিস্তর সদুপদেশ দিয়েছেন। চিঠিখানা থেকে কয়েকটি সদুপদেশ—তোমার নিজের যা দোষ তার প্রতি চক্ষুষ্মানের মতোই ব্যবহার করো, কিন্তু অন্যের দোষ সম্পর্কে অন্ধ হও; আপন দোষ প্রচার করো, অন্যের ভুলত্রুটি সন্ধান কোরো না; অপরের গুণাবলী প্রচার করো, নিজের গুণগুলি গোপন রাখো; মুনাফা এবং দান গ্রহণ কোরো না; শঙ্কা পরিহার করো; মৈত্রী ও করুণা ধ্যান করো।

নেপালের রাজাকে অতীশ দীপঙ্কর একটি হাতি উপহার দিয়েছেন। বোধ হয় এই হাতির পিঠে চেপেই অতীশ দীপঙ্কর ভারতবর্ষ থেকে নেপাল পর্যন্ত গিয়েছেন। হাতিটি নেপালের রাজাকে উপহার দিয়ে অতীশ দীপঙ্কর বললেন—এই হাতিটিকে যেন যুদ্ধের কোনও কাজে ব্যবহার না করা হয়।

নেপালে সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বীর্যসিংহ। সাধ্যমতো চেষ্টা করলেন অতীশ দীপঙ্কর কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না। বীর্যসিংহের অকালমৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়লেন অতীশ দীপঙ্কর। তিব্বতী সঙ্গীদের তিনি বললেন - আমাদের সৌভাগ্য নেই। আপনাদের সঙ্গে আর বীর্যসিংহ নেই।

সঙ্গীরা সান্ত্বনা দিলেন অতীশ দীপঙ্করকে। এখনও অনেক পথ বাকি।

নেপালের কাঠমুণ্ডু থেকে মুক্তিনাথ, খোচরনাথ ও তাকলাকোট হয়ে মানসসরোবরের দিকে হিমালয়ের একটি পথ আছে। লোকে বলে, অতীশ দীপঙ্কর সদলে হিমালয়ের এই পথেই মানসসরোবর গিয়েছেন।

হিমালয়ের পথ দুর্গম। চড়াই-উতরাইয়ের অন্ত নেই।—বরফ আর পাথর। বরফ আর পাথর। বনজঙ্গল—বড়-বড় গাছপালা,

ছোট-ছোট ঝোপঝাড়। নদীনালা আছে, হ্রদ আছে, ঝরনা আছে। কোথাও অতল খাদ। পাহাড় বেয়ে ধীবে ধীরে তুষারস্তূপ নেমে আসে। কোথায় কখন পাহাড় থেকে বৃষ্টিব মতো পাথরের পর পাথর গড়িয়ে পড়ে কে জানে। আবহাওয়া বিরূপ হলে ঝড়বৃষ্টিতে পথ আরও দুর্গম হয়ে ওঠে। কিন্তু চতুর্দিকে হিমালয়েব অপরূপ সৌন্দর্য দুর্গম পথের সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

অতীশ দীপঙ্কর হিমালয়ের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে চলেছেন।

তাকলাকোটের প্রায় বাবো মাইল দক্ষিণ পূর্বে কর্ণালী নদীব বাঁদিকে খোচরনাথ গুম্ফা। লোকে বলে, অতীশ দীপঙ্কর সেখানে একটি বর্ষাকাল কাটিয়ে গেছেন।

তারপর আছে 'পুণ্যদত্ত' নামে একটি গ্রাম। লোকে বলে, এই গ্রামটি অতীশ দীপঙ্করের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। এই গ্রামের খুব কাছে—হাজার গজেব মধ্যে—একটি বাস্তায়, লোকে বলে, অতীশ দীপঙ্করের পায়ের চিহ্ন আছে। এই গ্রামের পাঁচ মাইলের মধ্যে একটি জায়গার নাম 'পদচিহ্ন'। লোকে বলে, অতীশ দীপঙ্করের পায়ের ধুলোয় পবিত্র বলেই জায়গাটার নাম 'পদচিহ্ন'।

তারপর 'সিদ্ধসলিল' নামে একটি ঝরনা আছে। লোকে বলে, অতীশ দীপঙ্কর এই ঝরনাটি খুঁড়েছেন।

অতীশ দীপঙ্কর যখন তিব্বত সীমান্তে ঢুকলেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন তিব্বতের সেনাপতি—তাঁর সঙ্গে সাদা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে এসেছে একশ সৈন্য।

সেনাপতি বিনীতভাবে অতীশ দীপঙ্করকে বললেন—আমাদের দেশে আপনার আগমন কোনও অংশে দেবতার আবির্ভাবের চেয়ে কম নয়। এই করুণার জন্য আমরা আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

রাজপ্রতিনিধিরা তিব্বত সীমান্তে দীপঙ্করকে বিপুল সংবর্ধনা জানিয়েছেন। চীনা ড্রাগনের ছবি আঁকা একটি পাত্রে তাঁরা লবণ

সোডা ও মাখন দিয়ে তিব্বতী প্রথায় প্রস্তুত একটি নতুন পানীয় অতীশ দীপঙ্করকে নিবেদন করে বললেন—এই স্বর্গীয় পানীয় কল্পদ্রুম -এর নির্যাস থেকে তৈরি করা হয়।

অতীশ দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন—এই পানীয়টির নাম কি?

জয়শীল বললেন—গুরুদেব, এর নাম চা। তিব্বতের ভিক্ষুরাও এটি পান করেন।

অতীশ দীপঙ্কর বললেন—তিব্বতের ভিক্ষুদের উন্নত শীলের গুণেই চায়ের মতো এমন চমৎকার পানীয় প্রস্তুত হয়েছে।

প্রথম চা পানের পর অতীশ দীপঙ্কর চায়ের গুণগান করে একটি কবিতা পর্যন্ত রচনা করেছেন।

অতঃপর একটানে মানসসরোবরে চলে আসা যেতে পারে।

মানসসরোবর পৃথিবীর প্রাচীনতম হ্রদ, সবচেয়ে বিখ্যাত হ্রদ। বহু মানুষের কাছে মানসসরোবর পবিত্র তীর্থস্থান। এই সরোবরের আয়তন প্রায় দশ বর্গমাইল।

মানসসরোবরের কাকচক্ষু নীল জলে অজস্র মাছ ঘুরে বেড়ায়, রাশি-রাশি হাঁস চরে বেড়ায়।

মানসসরোবর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পনের হাজার ফুট উঁচুতে। তিনশ ফুট গভীর। পুব উপকূল প্রায় ষোলো মাইল, পশ্চিম উপকূল প্রায় তেরো মাইল, উত্তর উপকূল প্রায় পনের মাইল দক্ষিণ উপকূল প্রায় দশ মাইল—পরিধি একুনে প্রায় চুয়ান্ন মাইল; কোনাকুনি প্রায় পনের মাইল।

মানসসরোবরের একদিকে কৈলাস পর্বতমালা, আরেকদিকে জাসকর পর্বতমালা। উপকূলে নানা রঙের চকচকে অসংখ্য পাথর ছড়িয়ে আছে।

মানসসরোবর থেকে সরাসরি কোনও নদীর উৎপত্তি হয়নি; চতুর্দিকের পাহাড় থেকে কয়েকটি নদী এসে পড়েছে মানসসরোবরে।

কেউ বলতে পারে না সেসব নদীতে কখন কতখানি জল থাকবে কিংবা পাহাড়ের বরফ গলে কখন কতখানি জল বেড়ে যাবে। মানসসরোবরের চতুর্দিকে নদী—পুবে ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে শতদ্রু, উত্তরে সিন্ধু, দক্ষিণে কর্ণালী।

শীতকালে তিনদিনে সমস্ত মানসসরোবর বরফে ভর্তি হয়ে যায়; গোড়ার দিকে বরফ থাকে ধবধবে অস্বচ্ছ সাদা, মাসখানেকের মধ্যে বরফ অন্যরকম দেখায়—স্বচ্ছ নীল-সবুজ। গ্রীষ্মকালে বরফ গলে যায়, গলে যাওয়ার আগে বরফ ভাঙে; বরফ ভাঙার দিনদশেক আগে মানসসরোবরে বিচিত্র শব্দ ওঠে—যেন জগতের সব বাদ্যযন্ত্র ও জীবজন্তু একসঙ্গে আওয়াজ দিচ্ছে। বরফ যত তাড়াতাড়ি জমে তত তাড়াতাড়ি গলে না; বরফ গলে যাওয়ার পর আবার দেখা যায় মানসসরোবরের কাকচক্ষু নীল জল।

বাতাস না বইলে মানসসরোবর শান্ত। বাতাসের জোর বাড়লে ঢেউ ওঠে, বাতাসের জোরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বড়-বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে পাড়ে, জলের রঙ বদলে যায়, জলের তলা থেকে ঘাসের মতো লতাপাতা উঠে আসে, পরিচ্ছন্ন তট জঞ্জালে ভরে যায়। পাড়ে যাই হোক, সরোবরের মধ্যবর্তী জল অচঞ্চল থাকে। বাতাস থেমে গেলে আর ঢেউ নেই, সরোবর আবার শান্ত।

প্রত্যেক ঋতুতে মানসসরোবরের আলাদা সৌন্দর্য। সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে মানসসরোবরের সৌন্দর্য ও মহিমার কোনও তুলনা নেই।

অতীশ দীপঙ্কর মানসসরোবরে পৌঁছলেন। জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করলেন। এই পবিত্র ও সুন্দর সরোবর তাঁর খুব ভালো লাগল। তিনি এই সরোবরের তীরে সাতদিন থেকে গেলেন।

তিব্বতের রাজধানী থোলিং।

পঁয়ত্রিশজন সঙ্গী নিয়ে অতীশ দীপঙ্কর চলেছেন থোলিং-এর পথে। তিনি যাচ্ছেন একটি ঘোড়ায় চড়ে। উদাত্ত গম্ভীর গলায় অতীশ

দীপঙ্কর অনর্গল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন ; এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে মধুর ভঙ্গিতে বাংলায় বলে যাচ্ছেন—অতি ভাল ! ভাল অতি ভাল ! অতি মঙ্গল ! অতি ভাল হয়ে।

থোলিং-এর পথের দুপাশে জনতা অভিনন্দিত করেছে অতীশ দীপঙ্করকে।

রাজ্যের সকল মন্ত্রীকে নিয়ে রাজা বোধিপ্রভ এগিয়ে এসে অতীশ দীপঙ্করকে সসম্ভ্রমে বললেন—আমি ভিক্ষু বোধিপ্রভ। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত গুরুকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানাতে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি।

থোলিং আর দূরে নয়।

অতীশ দীপঙ্করকে নিয়ে যাওয়া হল থোলিং বিহারে। ১০৪২ সালের কথা। পরে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে নানা জায়গায় গিয়েছেন বটে, কিন্তু থোলিং বিহারের আগে তিনি তিব্বতে আর কোনও বৌদ্ধ মঠে পদার্পণ করেননি।

অতীশ দীপঙ্কর যখন তিব্বতে আসেন তখন তন্ত্রশাস্ত্রে রত্নভদ্রের চেয়ে বড় পণ্ডিত তিব্বতে আর কেউ ছিলেন না। রত্নভদ্র বয়সে অতীশ দীপঙ্করের চেয়ে পঁচিশ বছরের বড়।

রত্নভদ্র মনে-মনে ভাবলেন—আমার চেয়ে বড় পণ্ডিত ইনি কখনই নন। যা হোক, এঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যাক।

অতীশ দীপঙ্করকে নিমন্ত্রণ করলেন রত্নভদ্র।

নিমন্ত্রিত হয়ে অতীশ দীপঙ্কর এলেন। দেখলেন তান্ত্রিক দেবদেবীর বিস্তর মূর্তি ; রত্নভদ্রের সামনে তিনি প্রত্যেক মূর্তির উদ্দেশে এক-একটি স্তোত্র উচ্চারণ করলেন।

রত্নভদ্র বললেন—এই স্তোত্রগুলি কে রচনা করেছেন ?

অতীশ দীপঙ্কর উত্তর দিলেন—এগুলি এখনই আমি রচনা করলাম।

তারপর রত্নভদ্রের মুখে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের খবর নিলেন অতীশ দীপঙ্কর। সব শুনে তিনি বললেন—আপনার মতো মানুষ যখন আছেন তখন আমার তিব্বতে আসার দরকার ছিল না।

অতীশ দীপঙ্কর তারপর হাতজোড় করে রত্নভদ্রকে বললেন—দয়া করে বলুন, কীভাবে একজন মানুষ একাসনে বসে সব তন্ত্র সাধনা করতে পারে ?

রত্নভদ্র উত্তর দিলেন—একসঙ্গে নয়। প্রত্যেকটি তন্ত্র আলাদাভাবে সাধনা করতে হবে।

এই উত্তর শুনে অতীশ দীপঙ্কর বললেন—অপদার্থ! আপনি কোনও কাজের নন। এখন বুঝতে পারছি কেন আমার তিব্বতে আসার দরকার ছিল। সমস্ত তন্ত্র একই সঙ্গে সাধনা করা যায় ও করতে হবে।

অতীশ দীপঙ্কর তারপর রত্নভদ্রের কাছে তন্ত্রব্যাখ্যা করলেন। বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে রত্নভদ্র মনে-মনে ভাবলেন—মহা-মহা পণ্ডিতদের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

অতীশ দীপঙ্করের শিষ্য হয়ে গেলেন রত্নভদ্র। জীবনে রত্নভদ্র অনেক গুরুর দেখা পেয়েছেন বটে, কিন্তু অতীশ দীপঙ্করের দেখা পাওয়ার আগে প্রকৃত গুরুর দেখা পাননি।

অতীশ দীপঙ্কর তারপর রত্নভদ্রকে বললেন—এই সংসারে যন্ত্রণা দুঃসহ। তাই প্রত্যেকের প্রাণীহিতের জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার এখন দয়া করে ধ্যানাভ্যাস করুন।

অতীশ দীপঙ্করের কাছে রত্নভদ্র সাধনপ্রণালী শিখে নিলেন।

দিনের পর দিন রত্নভদ্র সাধনা করলেন। নিজের সাধনকক্ষের বাইরের তিনদিকের দরজায় রত্নভদ্র লিখে রাখলেন—যদি বিষয়সম্পত্তি বা স্বার্থপর কোনও চিন্তা ক্ষণকালের জন্যেও আমার মনে উদিত হয় তাহলে যেন ধার্মিকেরা আমার মস্তক চূর্ণ করেন।

আগেই হয়তো বলা ভালো ছিল, থোলিং বিহারে অতীশ দীপঙ্কর রচনা করেছেন 'বোধি-পথ-প্রদীপ'—তিব্বতে প্রত্যেক বৌদ্ধভিক্ষুর অবশ্যপাঠ্য এবং প্রত্যেক বৌদ্ধধর্মানুরাগীর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। 'বোধি-পথ-প্রদীপ' থেকে মাত্র তিনটি বাক্য উদ্ধৃত করি: "নিজের জন্য এবং কেবল সংসার সুখের জন্য যিনি সকল কাজ করেন তিনি অধম পুরুষ। যিনি সংসারসুখে উদাসীন এবং স্বভাবত অন্যায় কাজে বিমুখ হয়েও শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তিনি মধ্যম পুরুষ। নিজের ক্ষতি করেও অন্যের সকল দুঃখ দূর করতে যিনি সারাক্ষণ উৎসুক তিনি উত্তম পুরুষ।"

তিনবছর বাদে অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বত থেকে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—জয়শীল সেইরকম কথা দিয়ে এসেছেন বিক্রমশীল মহাবিহারের স্থবিরকে।

দেখতে-দেখতে তিন বছর তো হয়ে এল।

তিব্বতে অতীশ দীপঙ্করের সঙ্গে জয়াকরের প্রথম দেখা ১০৪৪ সালে।

জয়াকরের অনুনয়ে দীপঙ্কর তিব্বতে থেকে গেলেন। জয়াকরের অনুনয়েই অতীশ দীপঙ্কর মধ্যতিব্বতে যেতে আপত্তি করলেন না। বললেন—বৌদ্ধসঙ্ঘ যদি আমাকে আমন্ত্রণ জানায় তাহলে সে-আমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আমি নিশ্চয় যাব।

জয়শীল সব শুনে কাতর হয়ে অতীশ দীপঙ্করকে বললেন—বিক্রমশীল মহাবিহারের স্থবিরের কাছে আমি কথা দিয়ে এসেছি যে তিন বছর পরে আপনাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। প্রভু, আপনি ভারতবর্ষে ফিরে চলুন।

জয়শীলকে আশ্বাস দিয়ে দীপঙ্কর বললেন—তুমি যদি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারো তাহলে তোমার কোনও অপরাধ হবে না।

অতীশ দীপঙ্কর ভারতবর্ষে ফিরে না এসে জয়াকরের সঙ্গে মধ্যতিব্বত ভ্রমণ আরম্ভ করলেন। জয়াকরের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে অতীশ

দীপঙ্কর তিব্বতের বৌদ্ধদের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য।

অতীশ দীপঙ্কর তখণ মধ্যতিব্বতে আছেন।

তিব্বতের কয়েকজন পণ্ডিত একদা ল্‌হালামা নামে একজন বিজ্ঞ বৌদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—অমুক পণ্ডিতের কত জ্ঞান, তমুক পণ্ডিতের কত জ্ঞান ?

ল্‌হালামা উত্তর দিলেন—অমুক পণ্ডিতের অত জ্ঞান, তমুক পণ্ডিতের অত জ্ঞান।

তারপর প্রশ্ন হল—অতীশ দীপঙ্করের কত পাণ্ডিত্য ?

উত্তরে ল্‌হালামা আকাশের দিকে চোখ তুলে মুখে টকটক শব্দ করে বললেন—ওঃ, তাঁর পাণ্ডিত্য ! ওঃ, তাঁর পাণ্ডিত্য !

অর্থাৎ, ল্‌হালামার মতে অতীশ দীপঙ্করের পাণ্ডিত্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

জয়াকর তিব্বতে অতীশ দীপঙ্করের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত শিষ্য। তিনি বহুবার বিনীতভাবে বলেছেন—আমি একজন সামান্য উপাসক মাত্র এবং প্রভুর বিশ্বস্ত অনুচর; সকল কাজে প্রভুর আদেশ পালন করাই আমার জীবনের ব্রত।

বলা বাহুল্য হলেও বলা দরকার, তিব্বতেই অতীশ দীপঙ্কর শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন। অন্তিমকালে তিনি শিষ্যদের বললেন—আমি চলে যাচ্ছি। আমার জায়গায় কাজ করবে জয়াকর। আমাকে তোমরা যেমন শ্রদ্ধাভক্তি করো জয়াকরকে তেমনি শ্রদ্ধাভক্তি করবে। পার্থিব বিষয়ে বিহ্বল হবে না। তোমাদের আশীর্বাদ করি।

১০৫৪ সালে অতীশ দীপঙ্কর মারা গেছেন। শোকে বিহ্বল হয়েছেন জয়াকর। অতীশ দীপঙ্করকে প্রণাম নিবেদন করে জয়াকর স্বরচিত একটি স্তোত্রে বলেছেন: "এই হিমবৎ দেশে আমার চেয়ে ভক্তিমান অনেক ভক্ত আপনার আছে, তবু মাতা যেমন আপন সন্তানকে স্নেহ করেন তেমনি আপনার করুণার দ্বারা, হে আমার গুরু,

আপনি আমাকে পরিচালনা করুন। হে মহান, সর্বত্র, সর্বকালে যেন আপনাকে আমার নাথরূপে পাই ; সম্যক সম্বোধি লাভের জন্য আপনি আমাকে প্রথম উপদেশ দান করুন—"

অতীশ দীপঙ্কর যে-কালের মানুষ সেকালের ভারতবর্ষে তাঁর মতো চরিত্র, পাণ্ডিত্য, মনীষা ও অধ্যাত্মগরিমা আর কারও ছিল না। ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মধ্যে মিলনসেতু রচনায় অতীশ দীপঙ্করের কৃতিত্ব সকলের চেয়ে বেশি। ভারতবর্ষে, নেপালে ও তিব্বতে বিস্তর বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর প্রেরণায় পৃথিবীতে বৌদ্ধদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। তিব্বতীরা যখন বৌদ্ধধর্মের গূঢ় অর্থের ভুল ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছে তখন অতীশ দীপঙ্কর তাদের নির্ভুল পথ দেখিয়েছেন।

অতীশ দীপঙ্করের আগেও কয়েকজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে গিয়েছেন কিন্তু কেউই তাঁর মতো খ্যাতি ও সম্মান পাননি। সেযুগে তিব্বতের সকল শ্রেণীর মানুষের উপরেই অতীশ দীপঙ্করের উপদেশের প্রভাব পড়েছে। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছেন —তিব্বতের সাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তিব্বতের সংস্কৃতিতে অতীশ দীপঙ্কর আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। তিব্বতের মানুষের কাছে তিনি ন্যায্য কারণেই 'মহাপ্রভু' হিসেবে সম্মান পেয়েছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অতীশ দীপঙ্কর একজন প্রকাণ্ড পুরুষ, অসাধারণ শক্তিশালী। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে অতীশ দীপঙ্কর বাঙালির চিরগৌরব ; অতীশ দীপঙ্করের উপর এশিয়ার সমস্ত মানুষের এমন বিপুল শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁর নাম শুনলে রাজচক্রবর্তীদের মাথা নত হয়ে যেত ; বুদ্ধদেবের পর বৌদ্ধজগতে অতীশ দীপঙ্ককরের মতো আর কোনও মানুষ জন্মগ্রহণ করেননি।

তিব্বতের বহু লোক এখনও অতীশ দীপঙ্করকে দেবতা জ্ঞানে পুজো

করে।

এবং তিব্বত থেকে অনেক দূরে নিজের জন্মভূমিতে অতীশ দীপঙ্কর এখনও স্মরণীয় হয়ে আছেন। বজ্রযোগিনী গ্রামের একটি এলাকা দেখিয়ে লোকে এখনও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে—অতীশের ভিটে।

জয়দেব কেঁদুলি

বীরভূম জেলায় একটি গ্রামের নাম কেন্দুবিল্ব, চলতি কথায় কেঁদুলি

এই কেঁদুলিতে জয়দেব গোস্বামীর জন্ম। জয়দেবের বাবার নাম ভোজদেব, মায়ের নাম বামাদেবী।

জয়দেবের ছেলেবেলা কেটেছে, বলতে গেলে, বনেজঙ্গলে। ঘরবাড়ি ভাল লাগে না। ভাল লাগে গাছপালা, নদী, আকাশ, মাঠ আর গান। থেকে-থেকে মনে হয় কোথায় যেন বাঁশি বাজে। কার বাঁশি কে জানে।

কয়েকজন পাড়াপড়শি পুরীধাম থেকে তীর্থ সেরে ফিরে এসেছেন। তাঁদের মুখে দিনরাত কেবল পুরীধাম আর জগন্নাথের কথা।

পুরী মহাপুণ্যতীর্থ, সেখানে জগন্নাথের মন্দির আছে। মন্দিরে জগন্নাথের আসন একখানা পাথরের রত্নবেদী, ষোলো ফুট লম্বা, তেরো ফুট চওড়া, চার ফুট উঁচু। লোকে বলে, এই রত্নবেদীর মধ্যে লক্ষ শালগ্রামশিলা আছে। এই রত্নবেদীর মাহাত্ম্য বিপুল।

অসংখ্য ভক্ত জগন্নাথ দর্শনের জন্য পুরীতে এসেছেন। জগন্নাথের চোখে মানুষ ও কীট সমান, ধনী আর গরিব এখানে সমানভাবে জগন্নাথের সামনে দাঁড়াতে পারে। পুরীতে জাতবিচার নেই, জগন্নাথের

মহাপ্রসাদ পাওয়ার জন্য জাতপাতের প্রশ্ন অবান্তর।

শুনে মুগ্ধ হলেন জয়দেব। ঘর-সংসার ছেড়ে চলে গেলেন পুরীধামে। দিন কাটাতে লাগলেন জগন্নাথের সেবা করে। জয়দেবের ভক্তি দেখে অনেকেই মুগ্ধ। দু-একজন তাঁর শিষ্য পর্যন্ত হয়েছেন।

নিজের কন্যাকে নববধূ সাজিয়ে একদিন একজন ব্রাহ্মণ মন্দিরে এসেছেন। মানত আছে, এই কন্যাকে জগন্নাথের শ্রীচরণে উৎসর্গ করে দিতে হবে। কন্যার নাম পদ্মাবতী।

পদ্মাবতীকে নিয়ে ব্রাহ্মণ চলে গেলেন জগন্নাথের বেদীমূলে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন জগন্নাথকে। বললেন—আমার মানত ছিল পদ্মাবতীকে তোমার চরণে উৎসর্গ করব। আজ পদ্মাবতীকে তোমার চরণে উৎসর্গ করে দিতে এসেছি।

জগন্নাথ প্রত্যাদেশ দিলেন—জয়দেব নামে আমার একজন ভক্ত সংসার ছেড়ে আমার নাম সার করেছে। তুমি তাঁকেই এই কন্যা সম্প্রদান করো।

জগন্নাথের প্রত্যাদেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিলেন ব্রাহ্মণ। জয়দেবের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন—জগন্নাথ আমাকে তোমার হাতে পদ্মাবতীকে সম্প্রদান করার প্রত্যাদেশ দিয়েছেন।

জয়দেব বললেন—আমি সংসার ছেড়ে এসেছি, আর সংসারী হব না।

কিন্তু জগন্নাথের প্রত্যাদেশ ব্রাহ্মণ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিয়েছেন। তিনি পদ্মাবতীকে জয়দেবের কাছে রেখে চলে গেলেন।

জয়দেব হতভম্ব হয়ে পদ্মাবতীকে বললেন—তুমি কোথায় যাবে বলো, তোমাকে সেখানে রেখে আসি। আমার সঙ্গে তোমার থাকা হবে না।

পদ্মাবতী কাতরভাবে বললেন—জগন্নাথের আদেশে আমার বাবা আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করেছেন। তুমি আমার স্বামী। তুমি

যাই বলো, আমি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকব, কিছুতেই তোমাকে ছাড়ব না, সারাজীবন তোমার সেবা করব।

জয়দেব বললেন—এই মন্দিরের দরজার কাছে ধুলোয় আমার বাসা। আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে রাখব ?

পদ্মাবতী ঘাড় নেড়ে বললেন—তা আমি জানি না। তুমি যেখানেই থাকো, আমি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকব।

কী আর করা যায়, পদ্মাবতীকে নিয়ে জয়দেব সংসারী হলেন। চলে এলেন কেঁদুলিতে।

পদ্মাবতী নৃত্যগীতে নিপুণা।

কেঁদুলিতে জয়দেবের সামান্য কুটির। সব শূন্য লাগে। এত শূন্য লাগে কেন ? কারণ খুঁজে পাওয়া গেল। সামনাসামনি ভগবানের সেবা করতে না পারলে মন তো শূন্য লাগবেই।

অজয় নদের তীরে কদম্বখণ্ডীর ঘাট। এই ঘাটের বর্ণনায় আছে—অজয়ে তরঙ্গ বহে অতি সুশোভন। কিনারে পুষ্পের শোভা গন্ধে হরে মন। অনেক সময়ে জয়দেব এই ঘাটে এসে বসে থেকেছেন। এখানেই জয়দেব এক পৌষসংক্রান্তিতে দৈবাৎ পেয়ে গেলেন রাধামাধবের মূর্তি।

কেঁদুলিতে জয়দেব নিজের কুটিরেই রাধামাধবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে 'গীতগোবিন্দ' নামে একখানা কাব্য রচনায় হাত দিলেন তিনি। কৃষ্ণ, জয়দেবের কাছে, স্বয়ং ভগবান। প্রত্যেকদিন জয়দেব ভোররাত্রে উঠে রাধামাধবের আরতি করেন, সকালবেলা ফুল তুলে আনেন, পদ্মাবতী মালা গাঁথেন, জয়দেব লিখতে বসেন 'গীতগোবিন্দ'।

খানিকক্ষণ লেখার পর নদীতে স্নান করতে যান জয়দেব। স্নানের পর বাড়িতে এসে রাধামাধবের পুজো করে খাওয়াদাওয়া সেরে কিছুকাল বিশ্রাম করেন। তারপর আবার লিখতে বসেন।

দশম সর্গের নবম শ্লোকের 'মম শিরসি মণ্ডনম্' পর্যন্ত লিখে জয়দেব

সমস্যায় পড়লেন। কৃষ্ণ বলছেন রাধাকে—মম শিরসি মণ্ডনম···। অর্থাৎ জয়দেব লিখতে চাইছেন যে কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন—আমার শিরোভূষণ তোমার পরম সুন্দর পদপল্লব এই মস্তকে স্থাপন করো।

কিন্তু জয়দেবের চোখে কৃষ্ণ তো স্বয়ং ভগবান। তিনি কেমন করে লিখবেন যে রাধার পাদপদ্ম কৃষ্ণ নিজের মস্তকে স্থাপন করার কথা বলছেন?

এমন কথা লেখা জয়দেবের পক্ষে অসম্ভব। অথচ অন্য কোনও কথাও কলমে আসছে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কলম বন্ধ করলেন জয়দেব। সমস্যার কথা।

স্নান করতে চলে গেলেন জয়দেব।

পদ্মাবতীর চোখে পড়ল সেদিন জয়দেব অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগে স্নান সেরে ফিরে এলেন।

অন্যদিন যা করেন না, সেদিন তাই করলেন জয়দেব। পুঁথি খুলে কী যেন লিখলেন। তারপর রাধামাধবের পুজো করে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লেন।

জয়দেবের পাতে খেতে বসলেন পদ্মাবতী। বরাবরই এই নিয়ম।

খানিকক্ষণ বাদে দেখা গেল জয়দেব আবার স্নানান্তে বাড়িতে ঢুকছেন। পদ্মাবতী অবাক হয়ে গেলেন। এই তো খানিকক্ষণ আগে জয়দেব স্নান সেরে এসেছেন, পুঁথি খুলে কী যেন লিখেছেন রাধামাধবের পুজো করে খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়েছেন। আবার কীভাবে জয়দেব স্নান সেরে ফিরে এলেন?

পদ্মাবতীকে খেতে দেখে জয়দেবও অবাক হয়ে গেলেন। তিনি খাওয়ার আগে পদ্মাবতী তো কখনও খেতে বসেন না। আজ এই অনিয়ম কেন? জয়দেবকে দেখে খাওয়া ফেলে উঠে এলেন পদ্মাবতী।

পদ্মাবতীর মুখে সব শুনলেন জয়দেব। দুজনে ছুটে গেলেন ঘরের মধ্যে। কেউ কোথাও নেই। কিন্তু ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণের

শরীরের মনোহর সুগন্ধ।

জয়দেব পুঁথি খুলে দেখলেন, লেখা আছে—দেহি পদ-পল্লবমুদারম্ অর্থাৎ, স্বয়ং কৃষ্ণ এসে জয়দেব সেজে রাধার উদ্দেশে লিখে গিয়েছেন—…দেহি পদ-পল্লবমুদারম্, আমার শিরোভূষণ তোমার পরম সুন্দর পদপল্লব এই মস্তকে স্থাপন করো।

নিজের হাতে জয়দেব যা লিখতে পারেননি, জয়দেব সেজে স্বয়ং ভক্তবৎসল কৃষ্ণ তা লিখে দিয়ে গিয়েছেন।

আর কোনও সমস্যা রইল না।

জয়দেব বিহ্বল হয়ে বললেন—পদ্মাবতী, তুমি ধন্য। খানিকক্ষণ আগে যিনি আমার ছদ্মবেশে তোমাকে দেখা দিয়েছেন তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ পড়ে আছে থালায়। দুজনে খেতে বসলেন। এমন প্রসাদ কজনের ভাগ্যে জোটে!

এই ঘরবাড়ির ধুলোয় আজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ধুলো পড়েছে। ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে জয়দেব আর পদ্মাবতী বারংবার বলতে লাগলেন—দেহি পদ-পল্লবমুদারম্, দেহি পদ-পল্লবমুদারম্, দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।

তারপর কিছুদিনের মধ্যে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

রাধামাধবের সামনে জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' গান করতে লাগলেন। জয়দেবের বাল্যবন্ধু পরাশরও গলা মিলিয়ে দিলেন। পরাশরের গলাও বড় মধুর, গান বড় সুন্দর। পরাশরের গলায় 'গীতগোবিন্দে'র গান শুনে জয়দেব মুগ্ধ।

'গীতগোবিন্দে'র মহিমার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। 'গীতগোবিন্দে'র গান শুনে আত্মহারা হয়েছেন অসংখ্য ভক্ত ও ভাবুক। মানুষের মুখে-মুখে 'গীতগোবিন্দে'র গান।

'গীতগোবিন্দ' নিয়ে একটি আশ্চর্য কাহিনী আছে।

পুরীতে একদিন একজন মালিনী বেগুন ক্ষেতে বেগুন তুলতে-তুলতে 'গীতগোবিন্দে'র গান গাইছেন। তন্ময় হয়ে গান গাইতে লাগলেন মালিনী। কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর গানেব সুরে সুর মিলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। কে? কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। চোখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে কে যেন বেগুন ক্ষেতে ঘুবে-ঘুবে লুকিয়ে গান শুনছে আর সুর মিলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে।

পুরীর মন্দিরের দবজা যখন খোলা হল তখন দেখা গেল স্বয়ং জগন্নাথের সর্বাঙ্গে বেগুন ক্ষেতের ধুলো আর কাঁটা।

খবব পেয়ে পুরীর রাজা ছুটে এলেন। জগন্নাথের সর্বাঙ্গে এত ধুলো আর কাঁটা কেন? উত্তব পেতে দেরি হল না। জানা গেল, বেগুন ক্ষেতে মালিনীর 'গীতগোবিন্দ' গান শুনতে গিয়ে জগন্নাথের সর্বাঙ্গে এই ধুলো আর কাঁটা লেগেছে।

বাজা তখনই পালকি পাঠিয়ে দিলেন মালিনীর কাছে। মালিনী এলেন মন্দিরে। 'গীতগোবিন্দ' গান করলেন।

তারপর কতকাল চলে গেছে। এখনও জগন্নাথের মন্দিরে 'গীতগোবিন্দ' গাওয়া হয়। 'গীতগোবিন্দে'র প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ। 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাব্য। 'গীতগোবিন্দ' দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত, প্রত্যেক সর্গের আলাদা নাম। 'গীতগোবিন্দে' আশিটি শ্লোক ও চল্লিশটি গীত আছে।

সুকুমার সেনের মতে বাংলাভাষায় লেখা না হলেও 'গীতগোবিন্দ' বাঙালির কাব্য, কালিদাসের 'মেঘদূত' ছাড়া আর কোনও কাব্য সমগ্র ভারতবর্ষে এমন আদর পায়নি।

নানা ভাষায় 'গীতগোবিন্দে'র শতাধিক টীকা প্রণীত হয়েছে। 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে রচিত আটদশখানা কাব্যের নাম পাওয়া

যায়।

আবার কেঁদুলিতে ফিরে যাওয়া দরকার। কেঁদুলিকে বাদ দিয়ে জয়দেবের কথা বলা চলে না, আবার জয়দেবের কথা বাদ দিলেও কেঁদুলি নিঃস্ব হয়ে যায়।

কেঁদুলিতে শাকভাত খেয়ে জয়দেব ও পদ্মাবতীর দিন কেটে যাচ্ছে। অভাবের জন্য কারও কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু টাকাকড়ির অভাবে যেদিন রাধামাধবের পুজোয় বিঘ্ন ঘটে সেদিন মনে বড় কষ্ট হয়।

অন্তত কিছু টাকাকড়ি যোগাড় করতে পারলে রাধামাধবের পুজোয় আর কোনও বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে না। কিছু টাকাকড়ি যোগাড়ের আশায় জয়দেব বেরিয়ে পড়লেন। দিনের পর দিন কেটে গেল। দেশ-দেশান্তরের দরজায়-দরজায় ঘুরে কিছু টাকাকড়ি যোগাড় হল। যথেষ্ট হয়েছে, আর দরকার নেই। এবার কেঁদুলিতে ফিরে যাওয়া ভাল।

ফিরতি পথে একদিন জয়দেব একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। যেতে-যেতে উদাত্ত গলায় গাইছেন—ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।

হঠাৎ কয়েকজন ডাকাতের হাতে পড়লেন জয়দেব। তারা সব টাকাকড়ি কেড়ে নিল। তারপর জয়দেবকে একটা শুকনো কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

জয়দেব বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি কৃষ্ণ নাম নিতে লাগলেন—কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

ওই এলাকার রাজা তখন এই জঙ্গলে শিকার করতে এসেছেন। দৈবাৎ কৃষ্ণ নাম তাঁর কানে গেল। এখানে কে কৃষ্ণ নাম করে? কোত্থেকে আসছে এই কৃষ্ণ নাম?

গলার স্বর শুনতে-শুনতে শুকনো কুয়োর কাছে এলেন রাজা। জয়দেবকে উদ্ধার করলেন।

পালকিতে করে জয়দেবকে সযত্নে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন রাজা।

জয়দেব সারাক্ষণ শুধু কৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন। চ ন-চর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী।

জয়দেবের স্বভাবচরিত্র দেখে ও গান শুনে রাজা মুগ্ধ। কোনও একটা কাজ করে কি জয়দেবকে সন্তুষ্ট করা যায় না? রাজা ব্যাকুল হয়ে বললেন—আমি আপনার জন্য কী কাজ করলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন বলুন।

জয়দেব বললেন—আপনি প্রতিদিন অভ্যাগত বৈষ্ণবদেব সাধ্যমতো পবিচর্যা করুন। তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হব।

রাজবাড়িতে বৈষ্ণবসেবার ধুম পড়ে গেল। খবর পেয়ে প্রতিদিন অজস্র বৈষ্ণব আসছেন, প্রত্যেকে তৃপ্ত হয়ে ফিবে যাচ্ছেন।

কয়েকজন ডাকাত—যাবা একদিন জঙ্গলের মধ্যে জয়দেবেব টাকা-কড়ি কেড়ে নিয়েছে এবং জয়দেবকে শুকনো কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে—একদিন বৈষ্ণব সেজে রাজবাড়িতে এসে উপস্থিত।

জয়দেব চিনতে পাবলেন তাদের। বাজাকে বললেন - ওদেব যেন বিশেষভাবে পরিচর্যা করা হয়।

বিশেষ পরিচর্যা পেয়ে ডাকাতেব দল চিন্তায় পড়ল। জয়দেব নির্ঘাত তাদের চিনতে পেরেছে। সব কথা রাজাকে বলে জয়দেব এবার হয়তো তাদের শূলে চড়াবে।

পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডাকাতের দল।

কিন্তু কোথায় পালাবে? জয়দেবের অনুমতি নেই, অতএব তাদের রাজবাড়ি থেকে পালানোর পথ বন্ধ। চতুর্দিকে কড়া পাহারা। কিন্তু বিশেষ পরিচর্যায় কোনও ত্রুটি নেই।

ভয়ে-ভয়ে ডাকাতেরা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল।

জয়দেব বুঝতে পারলেন ওদের মনের অবস্থা।

জয়দেবের কথায় রাজা ওদের প্রচুর ধনদৌলত দিলেন। ধনদৌলত নিয়ে ওরা বিদায় হয়ে গেল। রাজার হুকুমে ওদের ধনদৌলত বয়ে নিয়ে

গেল রাজবাড়ির কয়েকজন ভৃত্য।

রাস্তায় যেতে-যেতে একজন ভৃত্য জিজ্ঞাসা করল--আজ্ঞে, আপনাদের বিশেষভাবে আদর-অভ্যর্থনা করার জন্য জয়দেব কেন রাজাকে এত অনুরোধ করলেন? জয়দেব কেন রাজাকে আপনাদের এত ধন-দৌলত দিতে বললেন? জয়দেব কি আপনাদের খুব চেনাজানা মানুষ?

ডাকাতদের সর্দার বলল—জয়দেব কে? ওঃ, ওই ভণ্ড বাবাজীর নাম বুঝি জয়দেব? হ্যাঁ, ও আমাদের খুব চেনাজানা মানুষ। আমরা এক রাজার বাড়ি চাকর ছিলাম। তোমাদেব ওই ভণ্ড বাবাজী সেখানে এমন কাণ্ড কবেছেন যে সেই রাজা রেগে আগুন, তাঁর হুকুমে আমরা ওই ভণ্ড বাবাজীকে মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছি। পাছে ওই ভণ্ড বাবাজীর কথা তোমাদের রাজাকে জানিয়ে দিই, এই ভয়েই উনি আমাদের বিশেষ আদর-অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছেন।

জয়দেবের নামে এত বড় মিথ্যেকথা শেষ করতে-না-করতে সর্দার আর তার দলের সব ডাকাত মাটিতে পড়ে গেল, যেন তাদের পায়ের তলায় মাটি চোখের পলকে সরে গেছে, যেন তাদের শরীরে আর প্রাণ নেই।

রাজবাড়ির ভৃত্যেরা ছুটতে- ছুটতে রাজবাড়িতে এসে এই অপূর্ব বৃত্তান্ত রাজাকে জানাল।

জয়দেবকে রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার?

ডাকাতদের কথা আগাগোড়া খুলে বললেন জয়দেব। তারপর বললেন—মহারাজ, পরহিংসা করা কর্তব্য নয়। দুষ্ট লোককেও দয়া করা উচিত। সেইজন্যই ডাকাতদের কোনও অনিষ্ট না করে ধন-দৌলত দিয়ে তাদের সম্মানিত করেছি।

কিছুদিন বাদে আবার কেঁদুলিতে ফিরে এলেন জয়দেব।

জয়দেব কোন আমলের মানুষ? লক্ষ্মণসেন সম্ভবতঃ ১১৭৯ সাল

থেকে ১২০৫ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলংকৃত করেছেন পাঁচজন বিখ্যাত কবি—ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব। এই পাঁচজন কবির মধ্যে জয়দেব নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।

একটি কাহিনী আছে।

রাজা লক্ষ্মণসেনেব সভায় একদিন একজন গুণী এসে বললেন—আমার নাম বুড়ন মিশ্র। সঙ্গীত এবং নানা শাস্ত্রে আমার সমান পাণ্ডিত্য।

শেখ জলালউদ্দীন তখন সেখানে উপস্থিত। তিনি বললেন—একটা রাগ আলাপ করুন তো, শুনি।

বুড়ন মিশ্র পঠমঞ্জরী রাগ আলাপ কবলেন।

কাছাকাছি একটা অশ্বত্থ গাছ। বুড়ন মিশ্রের গানে অশ্বত্থ গাছের সব পাতা ঝরে পড়ল।

সকলেই ধন্য ধন্য করে উঠলেন। বাজনা বাজতে লাগল। রাজা লক্ষ্মণসেন জয়পত্র দিতে রাজী হলেন বুড়ন মিশ্রকে।

পদ্মাবতী তখন গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। বাজনা শুনে তিনি সভায় এলেন। বললেন—আমি এবং আমার স্বামী থাকতে সঙ্গীতে জয়পত্র নেবেন কে? আপনারা আমার স্বামীকে খবর পাঠান।

শেখ জলালউদ্দীন বললেন—আপনার স্বামীর কথা পরে হবে। এখন আপনিই একটা রাগ আলাপ করুন।

পদ্মাবতী গান্ধার রাগ আলাপ করলেন।

গঙ্গায় অনেক নৌকো নোঙর করা ছিল। পদ্মাবতীর গানে সব নৌকো উজান বেয়ে চলে গেল।

সকলেই বললেন—কী আশ্চর্য, গাছ তো তবু সজীব, বুড়ন মিশ্রের গানে তার পাতা ঝরেছে। আর এ যে নির্জীব নৌকো উজান বেয়ে চলে গেল।

শেখ জলালউদ্দীন বললেন—আপনাদের দুজনের মধ্যে কে

জিতেছেন শাস্ত্রবিচারে তা সাব্যস্ত হোক।

বুড়ন মিশ্র বললেন—আমি কোনও মহিলার সঙ্গে বিচার করতে চাই না। এ-রাজ্যে দেখছি পুরুষেরা মূর্খ।

পদ্মাবতী তখন একজন দাসীকে পাঠিয়ে দিলেন বাড়িতে। বাড়ি থেকে জয়দেব চলে এলেন রাজসভায়।

আগাগোড়া বৃত্তান্ত শুনে জয়দেব বললেন—গাছের পাতা ঝরে পড়ল, এ আর আশ্চর্য কী। বসন্তকালে গাছের পাতা তো আপনা-আপনি ঝরে পড়ে।

শেখ জলালউদ্দীন বললেন—তা পড়ে কিন্তু একদিনে একসঙ্গেই তো সব পাতা ঝরে পড়ে না।

জয়দেব বললেন—আচ্ছা, ওই গাছটায় নতুন পাতা যাতে গজায় বুড়ন মিশ্র তার ব্যবস্থা করুন।

বুড়ন মিশ্র বললেন – তা আমি পারব না।

শেখ জলালউদ্দীন তখন জয়দেবকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি পারেন ?

জয়দেব বললেন – পারি।

বলে জয়দেব বসন্ত রাগ আলাপ করলেন। জয়দেবের গানে গাছটি নতুন কচি পাতায় ভরে উঠল।

বুড়ন মিশ্র হার মেনে নিলেন। রাজসভায় জয়দেবের খুব প্রশংসা হল।

কিছুকাল পর বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন জয়দেব।

রাধামাধবকে ঝুলিতে নিয়ে জয়দেব রওনা হলেন। কেঁদুলি থেকে বৃন্দাবন অনেক দূরে। তা হোক। রাধামাধবকে নিয়ে জয়দেব একদিন বৃন্দাবনে এলেন। সেখানে একজন ভক্ত কেশীঘাটে রাধামাধবের জন্য একটি মন্দির করে দিলেন।

জীবনের অন্তিমপর্বে আবার কেঁদুলিতে ফিরে এসেছেন জয়দেব

কেঁদুলি থেকে গঙ্গা আঠারো ক্রোশ দূরে। লোকে বলে, জয়দেব প্রত্যহ আঠারো ক্রোশ পথ হেঁটে গঙ্গাস্নান করেছেন। এক পৌষ-সংক্রান্তিতে, কী কারণে কে জানে, গঙ্গাস্নানে যেতে পারেননি। সেদিন তাঁর মনে খুব দুঃখ, আজ আর গঙ্গাস্নান হল না।

সেদিন, শোনা যায়, কলকল করে গঙ্গা কেঁদুলিতে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে এসে উপস্থিত। জয়দেবের মনে আর কোনও দুঃখ রইল না। জয়দেবের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে, লোকে বলে, মা গঙ্গা স্বপ্নে বলেছেন, প্রত্যেক পৌষ-সংক্রান্তিতে আমি অজয়ের উজান বেয়ে কেঁদুলির কদম্বখণ্ডীর ঘাটে এসে হাজির হব, তখন অজয়ে স্নান করলেই গঙ্গাস্নানের পুণ্য হবে।

জয়দেব মারা গেছেন কেঁদুলিতে। তারপর জয়পুরের রাজা বৃন্দাবন থেকে রাধামাধবের মূর্তি জয়পুরে নিয়ে গেছেন, জয়পুরের 'ঘাটি'তে স্থাপিত হয়েছে রাধামাধবের সেই মূর্তি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিদের নাম উল্লেখ করতে হলে সহজেই জয়দেবের নাম এসে পড়ে—অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভর্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিহ্লন, শ্রীহর্ষ, জয়দেব; ভারতবর্ষের প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলতে হয়; মহাকবি কালিদাসের ভারত-ব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাবের তুলনা হতে পারে।

কিন্তু জয়দেব কি শুধুই একজন কবি? না। জয়দেব ধার্মিক ও পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধক, ভাবুক ও কবি।

জয়দেবের স্মৃতিতে এখনও কেঁদুলিতে প্রত্যেক পৌষসংক্রান্তিতে উৎসব হয়। সাধু-সন্ন্যাসী সমেত অসংখ্য মানুষ কেঁদুলিতে আসেন এই উৎসবে।

কবে থেকে এই উৎসব আরম্ভ হয়েছে কে জানে।

কেঁদুলিতে জয়দেবের বাস্তুভিটে কোথায়? লোকে বলে, জয়দেবের বাস্তুভিটের উপরেই গড়ে উঠেছে রাধাবিনোদের মন্দির।

পৌষসংক্রান্তিতে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে পুন্যস্নান সেরে অসংখ্য মানুষ রাধাবিনোদের মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করেন, পুজো দেন। উৎসবের প্রথম দিন থেকেই মন্দিরে অখণ্ড হরিনামসংকীর্তন আরম্ভ হয়ে যায়। তিনদিনব্যাপী উৎসব। দিনরাত বিস্তর গানের আসর চলে। আসরে-আসরে ভক্ত গায়কেরা নেচে-নেচে গানের পর গান গেয়ে যান, গায়কের কোমরের বাঁদিকে ডুগি, ডান হাতে একতারা, দোতাবা বা গুপিযন্ত্র, হাতের কবজিতে আর পায়ে বাঁধা ঘুঙুর। গানের আসরগুলি দেখা যায় কদম্বখণ্ডীর ঘাটের আশেপাশে মস্ত-মস্ত বটগাছের তলায়। এবং জাঁকজমক করে মেলা বসে।

কেউ বলে জয়দেবের মেলা, কেউ বলে কেঁদুলির মেলা। এই কেঁদুলিকে বাদ দিয়ে জয়দেবেব কথা বলা চলে না, আবার জয়দেবের কথা বাদ দিলেও এই কেঁদুলি নিঃস্ব হয়ে যায়। জয়দেব আর কেঁদুলির নাম অচ্ছেদ্যসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। এই কেঁদুলি অনেকের কাছে আর শুধু 'কেঁদুলি' নেই হয়ে উঠেছে 'জয়দেব-কেঁদুলি'।

জলালুদ্দীন

উত্তরবঙ্গের একজন জমিদারের নাম গণেশ। নিজের শক্তিতে তিনি একদিন বাঙলার সিংহাসনে বসেছেন। সামান্য জমিদার ছিলেন, অসামান্য রাজা হলেন। রাজা গণেশ। তাঁর আগে যুগের পর যুগ বাঙলার সিংহাসন ছিল মুলতানদের দখলে; এবং তাঁদের কারও পিতৃ-ভূমিই বাঙলা নয়।

রাজা গণেশ বাঙালি হিন্দু। তিনি বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

রাজা গণেশের রাজ্যের আয়তন নিতান্ত অল্প নয়—উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ; এবং মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কিয়দংশ।

রাজা গণেশ সিংহাসনে বসবার সঙ্গে-সঙ্গেই দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ আরম্ভ হয়ে গেল। বিরোধী দরবেশদের রাজা গণেশ নির্মম হাতে দমন করলেন।

বিরোধ চরমে উঠল।

রাজা গণেশ একদিন সভায় বসে আছেন, এমন সময়ে বদর-উল-ইসলাম নামে একজন দরবেশ সেখানে এলেন। রাজাকে অভিবাদন না জানিয়েই তিনি সভায় বসে পড়লেন। এমন অশিষ্ট কাজ কেন করলেন? রাজা গণেশের এই প্রশ্নের উত্তরে বদর-উল-ইসলাম

বললেন—শিক্ষিত লোক বিধর্মীকে অভিবাদন করেন না।

রাজা গণেশ সেদিন তাঁকে কিছু বললেন না।

আরও একদিন বদর-উল-ইসলাম অপমান করলেন রাজা গণেশকে। সেবার রাজা গণেশ আর সহ্য করলেন না, হত্যা করলেন বদর-উল-ইসলামকে; এবং সেদিনই রাজা গণেশের আদেশে পাণ্ডুয়ার অনেক দরবেশ ও মুসলমান পণ্ডিতকে জলে ডুবিয়ে মারা হল।

দরবেশদের নেতা নূর কুৎব্ আলম। রাজা গণেশকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি চিঠিতে অনুরোধ জানালেন জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে।

অনুরোধ নিষ্ফল হয়নি।

ইব্রাহিম শর্কী বিস্তর সৈন্য নিয়ে বাঙলাদেশ আক্রমণ করলেন ১৪১৫ সালে। রাজা গণেশের তখন সমূহ বিপদ। ইব্রাহিম শর্কীর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়ার মতো শক্তি রাজা গণেশের নেই।

ইব্রাহিম শর্কীর প্রতাপের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেলেন রাজা গণেশ। তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হল। রাজা গণেশের পুত্র যদু বিরোধীদলে যোগ দিয়েছিলেন; দীক্ষা নিয়েছিলেন ইসলামধর্মে। ইব্রাহিম শর্কী বাঙলার সিংহাসনে যদুকে বসিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। না, আর যদু নয়। যদুর নতুন নাম হয়েছে—জলালুদ্দীন।

রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন!

সুলতান জলালুদ্দীন খাঁটি মুসলমানের মতো রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদেই আবার সমস্ত ক্ষমতা চলে গেল রাজা গণেশর হাতে। জলালুদ্দীন রইলেন নামে মাত্র সুলতান। আসলে রাজা গণেশই সর্বেসর্বা।

প্রায় দু-বছর জলালুদ্দীন নামে মাত্র সুলতান থেকেছেন। তারপর রাজা গণেশ যখন বুঝলেন যে আর কোনো ভয় নেই তখন আবার তিনি নিজেই বাঙলার সিংহাসনে বসলেন। এবং রাজা গণেশ দ্বিতীয়বার

সিংহাসনে বসে জলালুদ্দীনকে শোধন করে হিন্দু বানালেন।

জলালুদ্দীন আবার 'যদু' হলেন। এখানে বলে রাখা ভাল, শোধন হলে কী হবে, ইসলাম ধর্মের উপর তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

রাজা গণেশ মারা গেলেন ১৪১৮ সালে। সমসাময়িক একজন আরবি ঐতিহাসিকের মতে আপন পুত্রই হত্যা করেছেন রাজা গণেশকে।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর যদু রাজ্যের বড়মানুষদের ডেকে বললেন—ইসলাম ধর্মের সত্য আমার কাছে পরিষ্কার, তাকে গ্রহণ করা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই।

আবার মুসলমান হলেন। আগের বার নতুন নাম হয়েছিল 'জলালুদ্দীন,' এবারেও সেই নামই বজায় রইল।

আবার জলালুদ্দীন বাঙলার সিংহাসনে বসলেন।

অকাট্য প্রমাণ না পেলে ইতিহাস চুপ করে থাকে। কিন্তু মানুষের মুখ বন্ধ হয় না; মানুষের মুখে মুখে যদু-জলালুদ্দীনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটি করুণ রঙিন কিংবদন্তী।

শুনতে ইচ্ছা করে? তাহলে শোনো।

যদুর মায়ের নাম ত্রিপুরা, স্ত্রীর নাম নবকিশোরী। নবকিশোরীর একটিমাত্র শিশুপুত্র, নাম—অনুপ। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর ওঁরা পাণ্ডুয়ায় খবর পেলেন যে আসমানতারা নামে একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছেন জলালুদ্দীন।

খবর পেয়ে পাণ্ডুয়া থেকে ত্রিপুরা আর নবকিশোরী দলবল নিয়ে গৌড়ে চলে এলেন।

আসমানতারাকে নিয়ে জলালুদ্দীন গৌড়ের দুর্গে লুকিয়ে রইলেন।

ভয়ে নয়, লজ্জায়।

রাগে ও দুঃখে রানী নবকিশোরী অস্থির হয়ে উঠলেন—তিনি নিজের হাতে আসমানতারাকে কেটে ফেলবেন। খাঁড়া হাতে নিয়ে তিনি ছুটে গেলেন, কিন্তু দুর্গে ঢুকতে না পেরে ফিরে এলেন।

মহারানী ত্রিপুরা সৈন্যসামন্ত ও প্রজাদের ডেকে বললেন—শাস্ত্রমতে জাতিপাত অপমৃত্যুর সমান। যদুর জাতিনাশ হয়েছে, সমস্ত স্বত্বও নাশ হয়েছে। এখন তার পুত্র এই শিশু অনুপ সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। আমি অনুপকে বাদশাহী দেব। তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

কিন্তু কোথায় সাহায্য!

জলালুদ্দীনের দেওয়ানের নাম রাজা জীবন রায়। তিনি মহারানীকে বললেন—মহারানী যা বললেন তা অবশ্যই শাস্ত্রের কথা। কিন্তু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। সৈন্য ও সেনাপতির অধিকাংশই মুসলমান। মহারাজ মুসলমান হয়েছেন বলে তাঁরা খুব তুষ্ট। তাঁরা নিশ্চয় মহারাজের পক্ষে থাকবেন। মহারাজ নিজেও খুব বুদ্ধিমান বীরপুরুষ। তাঁকে হারানো অতএব অসম্ভব। রাজা গণেশ যে-বংশের সন্তান সে-বংশের আসল রাজ্য তো ভাদুড়ীয়া। আপনারা সেখানে অনুপকে রাজা করুন। তাতে বোধ হয় বাদশাহ কোনও আপত্তি করবেন না।

দেওয়ানজী ভাল কথা বলেছেন। মহারানী ত্রিপুরা আপত্তি করলেন না।

এবার তাহলে চলে যাওয়ার পালা। নৌকো যোগাড় হল। মহারানী ত্রিপুরা তারপর দেওয়ানকে বললেন—তোশাখানা খুলে দাও।

কিন্তু বাদশাহের হুকুম না পেলে দেওয়ান কোন সাহসে তোশাখানা খুলে দেবেন? হুকুম নিতে দেওয়ান গেলেন বাদশাহের কাছে। বাদশাহ বললেন—তোশাখানা খোল। মায়ের যা ইচ্ছা সেই নিয়ে যেতে দাও। তারা যাতে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারেন তার চেষ্টা

করো।

তোশাখানার দরজা খুলে গেল। তোশাখানা উজাড় করে বিস্তর জিনিসে নৌকো বোঝাই হল। জলালুদ্দীন দূত মারফত মাকে প্রণাম পাঠালেন। মহারানী ত্রিপুরা রাগ করে বললেন—আমার যদু এখন নেই, সে মরেছে।

দলবলসমেত মহারানী ত্রিপুরার নৌকো চলল সাতগড়ার দিকে।

ভাদুড়ীয়া ও আরও কিছু অঞ্চল অধিকার করে মহারাণী ত্রিপুরা রাজ্যশাসন চালাতে লাগলেন অনুপের অভিভাবিকা হয়ে। নিজে রাজাসনে বসেননি মহারানী ত্রিপুরা, দরবারে আলাদা আসনে বসে রাজকার্য করেছেন। বাদশাহকে নজরানা ও খাজনা দেওয়া নিয়ম ; কিন্তু মহারানী ত্রিপুরা বাদশাকে নজরানা বা খাজনা দেননি।

জলালুদ্দীনের কুশপুত্তলিকা দাহ করল অনুপ। আর সেদিন থেকে রানী নবকিশোরী জীবন কাটিয়েছেন বিধবার মতো। কোনো কথাই জলালুদ্দীনের অজানা রইল না। স্বামী জ্যান্ত থাকতেও রানী নবকিশোরী বিধবা!

অনুপ আর শিশু নেই। সময় হয়েছে—মহারানী ত্রিপুরা মহা-ধুমধামে অনুপের বিবাহ ও রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করলেন। মহারানী ত্রিপুরা কিছুই জানালেন না জলালুদ্দীনকে। কিন্তু রানী নবকিশোরী ব্যঙ্গ করে চিঠিতে নেমতন্ন জানিয়েছেন জলালুদ্দীনকে ; "মৃত মহারাজা যদুনারায়ণ খাঁ সাহেবের পুত্র শ্রীমান অনুপনারায়ণ শর্ম খাঁ সাহেবের শুভ বিবাহ ও ভাদুড়ী রাজ্যে অভিষেক হইবেক। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। হুজুর আলি বেগম সহ আগমন পূর্বক শ্রীমানের কল্যাণ প্রার্থনা করিবেন এবং সভাসৌষ্ঠব করিবেন।"

জলালুদ্দীন কী উত্তর লিখবেন রানী নবকিশোরীকে? ভেবেচিন্তে তিনি নিজের হাতে উত্তর দিলেন আসমানতারার খেনানীতে ; "শ্রীযুক্ত

বাদশাহের নামিক আপনকার প্রেরিত পত্রে শ্রীমান অনুপনারায়ণ বাবাজীর শুভ বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীযুক্ত বাদশাহ নামদার এবং আমরা সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। স্বর্গীয় মহারাজ গণেশনারায়ণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুয়ার দেবালয়ে এবং গৌড়ের মসজিদে শ্রীমানের কল্যাণার্থ পূজা ও উপাসনার আদেশ করা হইল। নিমন্ত্রণরক্ষার্থ শ্রীযুত রাজা জীবন রায় দেওয়ানজীকে অভিষেক সামগ্রী সহ পাঠাইলাম। লজ্জাপ্রযুক্ত আমি ও বাদশাহ নিজে যাইতে পারিলাম না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

চিঠিখানা পেলেন রানী নবকিশোরী। বেনামীতে হলেও হাতের লেখা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন আসলে চিঠিখানা কে লিখেছেন।

শুভদিনে পুরনো দুঃখ শতগুণ হয়ে বুকে বাজল।

রানী নবকিশোরী নিজেকে সামলাতে পারলেন না। মহারানী ত্রিপুরা রাগ করে রানী নবকিশোরীকে বললেন—কি লো বউ, এত বেলা হল তুই মঙ্গলচণ্ডী পুজোয় বসিসনি, পুবনো কান্না কাঁদছিস। যা গিয়েছে তা হাতের বালাই পায়ের বালাই গিয়েছে, যা আছে তারই মঙ্গল দ্যাখ। তুই কি এই শুভদিনে কেঁদে আমার অনুপের অমঙ্গল করবি?

রানী নবকিশোরী শাশুড়িকে প্রণাম করলেন। তাড়াতাড়ি পুজোর জন্য চণ্ডীপণ্ডপে গেলেন।

অনুপের বিবাহ ও অভিষেক নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল।

বিবাহ ও অভিষেকে কী ঘটা! অনুপ আর তার স্ত্রীকে কোলে নিয়ে মহারানী ত্রিপুরা দরবারে সিংহাসনে বসলেন। তারপর জোড়া-হাতির উপর হাওদায় চড়ে সমস্ত নগর ঘুরলেন। টাকাকড়ির তো দুঃখ নেই, সপ্তাহকাল অজস্র দান করলেন। সমস্ত কয়েদি মুক্তি পেল, সঙ্গে পথখরচা। চাকরদের বিস্তর ইনাম দিলেন। প্রত্যেক প্রজার এক বছরের খাজনা মাপ হয়ে গেল। জলালুদ্দীনের লোকজনকেও

মহারানী ত্রিপুরা প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

জলালুদ্দীদেনের একজন কর্মচারী বলল—রানীমা, আপনার পুত্রের···

তাকে থামিয়ে দিয়ে মহারানী ত্রিপুরা বললেন—আমার পুত্র, পৌত্র—সর্বস্ব এই অনুপ। পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।

বলতে-বলতে চোখের জলে মহারানী ত্রিপুরার বুক ভেসে গেল।

নিজের শাড়ি ও অলঙ্কার একটি পেঁটরায় ভরে আসমানতারাকে উপহার পাঠালেন রানী নবকিশোরী। উপহারের সঙ্গে আসমানতারাকে লেখা রানী নবকিশোরীর চিঠিখানা এইরকম: "দেওয়ানজী সাহেব সহ তোমার প্রেরিত দ্রব্যজাত যথাসময়ে পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। তোমাদের আশীর্বাদে শ্রীমানের অভিষেক নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। আমি বিধবা, আমার শাড়ি ও অলঙ্কার অব্যবহার্য। অনুপের বধূকে রানীমা সমস্তই নূতন তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমার বসন-ভূষণ তোমাকে পাঠাইয়া দিলাম। তুমি ভাগ্যবতী, তাহা ব্যবহার করিয়া সার্থক করিবে। আমি পাগল হইয়াছি বলিয়া সকল দোষ ক্ষমা করিবে।"

আর জলালুউদ্দীনকে রানী নবকিশোরী পাঠালেন একটি কৌটো—এই কৌটোর মধ্যে আছে তাঁর ভাঙা শাঁখার টুকরোগুলো। এই কৌটো পেয়ে দুঃখে জলালুদ্দীনের বুক ভরে গেল।

তারপর রানী নবকিশোরী আর বেশিদিন বাঁচলেন না, অকালে মারা গেলেন।

এবং জলালুদ্দীন মারা গেলেন ১৪৩৩ সালে।

তারপর সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র সামসুদ্দীন আহমদ শাহ।

অনুপ আর আহমদ—এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কখনও ঝগড়া-বিবাদ হয়নি, বরাবর ভাব-ভালোবাসা বজায় থেকেছে।

সাদী খাঁ ও নাসির খাঁ নামে আহমদের দুজন ক্রীতদাস ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেছে।

আহমদের মৃত্যুর পর আসমানতারা আশ্রয় নিলেন অনুপের কাছে। রাজবাড়ির একখানা ঘরে অনুপ আশ্রয় দিলেন আসমানতারাকে। অনুপ আসমানতারাকে 'মা' বলে ডাকেন, প্রত্যেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তাঁর পরামর্শ নেন।

আসমানতারা ভয়ে মহারানী ত্রিপুরার সঙ্গে দেখা করতে যাননি। মহারানী ত্রিপুরা নিজেই একদিন এলেন আসমানতারার ঘরে। আসমানতারা কাঁপতে-কাঁপতে লুটিয়ে পড়লেন মহারানী ত্রিপুরার পায়ে।

মহারানী ত্রিপুরা একটিও কটুকথা বললেন না। আসমানতারাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—যা গেছে তার চিন্তায় কোনো ফল নেই। এখন অনুপকেই পুত্র মনে করো। সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-আপ্যায়ন করো, তাতেই মনে শান্তি পাবে। যত নির্জনে থাকবে ততই দুঃখ বাড়বে, সুশ্চিন্তা বাড়বে। আমার সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা কোরো। যা কিছু দরকার হয় আমাকে বোলো। আমার কাছে চাইতে লজ্জা নেই। তোমার যখন যা লাগবে আমি দেব।

আসমানতারার আর ভয় রইল না। তারপর মহারানী ত্রিপুরা যতদিন বেঁচেছিলেন আসমানতারা প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন।

মহারানী ত্রিপুরার মৃত্যুর পর আসমানতারা কিন্তু বহুদিন জীবিত থেকেছেন। এবং জীবন কাটিয়েছেন বামুনের ঘরের বিধবার মতো—নিয়মমতো নিরামিষ খেয়েছেন, একবস্ত্রে থেকেছেন, তুলসীতলায় বসে হরিনাম জপেছেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে আরতি দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছেন।

পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদ, লোকে বলে, রাজা গণেশের কীর্তি। এই প্রাসাদের মধ্যে তিনটি সমাধি আছে। এই তিনটি সমাধি, শোনা যায়, জলালুদ্দীন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের।

গোপীনাথ

বিশ্বম্ভরের বাবার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মায়ের নাম শচীদেবী। বিশ্বম্ভরের জন্ম নবদ্বীপে, ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। ডাক নাম—নিমাই। বিশ্বম্ভরের দাদার নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বম্ভরের বয়স যখন ছ-সাত বছর তখন বিশ্বরূপ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন।

ছেলেবেলায় বিশ্বম্ভর খুব দুরন্ত ছিল। কিন্তু ওকে দেখলে ওর উপর কারও রাগ থাকত না; সকলেই ওকে দেখে খুশি।

সময়মতো বিশ্বম্ভরের পইতে হল। তারপর বিশ্বম্ভর ভর্তি হল গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে। অনায়াসে শিখে ফেলল অভিধান, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার।

কিছুকাল বাদে জগন্নাথ মিশ্র মারা গেলেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর পড়াশোনা ছাড়ল না; পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে রইল।

ষোল বছর বয়সে বিশ্বম্ভর আরম্ভ করলেন অধ্যাপনা। বিবাহ করলেন বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে।

কিছুকাল নবদ্বীপে পড়ানোর পর বিশ্বম্ভর অধ্যাপনা করতে গেলেন পূর্ববঙ্গে। সেখান থেকে মাসকয়েক পর নবদ্বীপে ফিরে এসে তিনি শুনলেন যে লক্ষ্মীপ্রিয়া সাপের কামড়ে মারা গেছেন। তিনি আবার

বিবাহ করলেন সনাতন রাজপণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

বিবাহেব কিছুকাল পব বিশ্বম্ভর কয়েকজন ছাত্রশিক্ষা নিয়ে গয়ায় গেলেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরপুবীর কাছে পোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বম্ভরের চরিত্র যেন আবেক রকম হয়ে গেল। ভক্তিব বন্যায় যেন তিনি দিশেহাবা হলেন। অন্য মানুষ হয়ে বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে ফিবে এলেন।

বিশ্বম্ভর অধ্যাপনা ছাড়লেন। ছাত্রশিক্ষকদের শেখালেন নাম-সংকীর্তন হরি হবয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ বাম শ্রীমধুসূদন।

আস্তে-আস্তে নবদ্বীপ ভবে উঠল নামসংকীর্তনে। বিশ্বম্ভবের মহিমায় নবদ্বীপে কারও কোনও সংশয় বইল না।

মায়ের অনুমতি নিয়ে বিশ্বম্ভর কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভাবতীর কাছে সন্ন্যাস নিলেন—১৫১০ সালের কথা। গুরু কেশব ভারতী শিষ্য বিশ্বম্ভরের নতুন নাম দিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংক্ষেপে—চৈতন্য।

ভক্তদের মুখে তিনি—প্রভু, মহাপ্রভু।

তাঁর রূপলাবণ্যের জন্য কেউ-কেউ বলেন—গৌর, গৌরাঙ্গ, গৌরহরি।

সন্ন্যাসী হয়ে কাটোয়া থেকে চৈতন্যদেব এলেন শান্তিপুরে।

নবদ্বীপ থেকে শচীদেবী ও ভক্তেরাও এলেন সেখানে।

চৈতন্যদেবের ইচ্ছা যে তিনি মথুরা-বৃন্দাবনে চলে যাবেন।

কিন্তু নবদ্বীপ থেকে মথুরা-বৃন্দাবন অনেক দূরে, পুরী অনেক কাছে। মায়ের ইচ্ছা যে সন্তান মথুরা-বৃন্দাবন না গিয়ে পুরীতে যায়।

মায়ের ইচ্ছা মেনে নিলেন চৈতন্যদেব।

শান্তিপুর থেকে পুরী।

পুরীতে অল্পদিন থেকে চৈতন্যদেব দক্ষিণদেশে তীর্থ করতে গেলেন। তীর্থে-তীর্থে কমদিন কাটল না। আবার ফিরে এলেন পুরীতে। কাশী-

মিশ্রের নির্জন বাগানবাড়িতে চৈতন্যদেবের বাসা।

১৫১৪ সালের অক্টোবরে চৈতন্যদেব চললেন গৌড়ের দিকে। নানা জায়গা পার হয়ে এলেন শান্তিপুরে। শচীদেবী সেবারেও শান্তিপুরে এসেছেন। শান্তিপুর থেকে চৈতন্যদেব গেলেন রামকেলি গ্রামে, সেখান থেকে আবার ফিরে এলেন শান্তিপুরে। দিনকয়েক শান্তিপুরে থাকলেন, মায়ের কাছে অনুমতি নিলেন বৃন্দাবন যাওয়ার।

চৈতন্যদেব বর্ষাকাল পুরীতে কাটালেন। তারপর রওনা হলেন। ঝারিখণ্ড-ছোটনাগপুরের বনপথ ধরে কাশী, সেখান থেকে প্রয়াগ, প্রয়াগের পর মথুরা-বৃন্দাবন। তারপর ফেরার পালা। আবার পুরী। তারপর আঠারো বছর তিনি পুরী ছেড়ে আর কোথাও যাননি। কাশী মিশ্রের নির্জন বাগানবাড়িতে চৈতন্যদেব শেষপর্যন্ত থেকেছেন।

চৈতন্যদেব প্রচারিত ধর্মের আসল কথা—জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, ভক্তির জন্য নামসংকীর্তন। তিনি হিন্দু-অহিন্দু, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে ভক্তিধর্ম প্রচার করেছেন।

গোপীনাথের সূত্রে চৈতন্যদেবের নামের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে। গোবিন্দ ঘোষের নাম।

গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যদেবের একজন মহাভক্ত।

চৈতন্যদেব চলেছেন এখান থেকে ওখানে, সঙ্গে অনেক ভক্ত, অনেক ভক্তের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষও আছেন।

একদিন চৈতন্যদেব খাওয়াদাওয়ার পর মুখশুদ্ধির জন্য হাত বাড়ালেন। গোবিন্দ ঘোষ কাছে ছিলেন, তিনি ছুটে গেলেন গ্রামের মধ্যে। ভিক্ষে করে নিয়ে এলেন একটি হরীতকী।

চৈতন্যদেবের হাতে একখণ্ড হরীতকী দিলেন গোবিন্দ ঘোষ।

পরদিন চৈতন্যদের ভক্তদের সঙ্গে অগ্রদ্বীপে এসেছেন। সেদিনও খাওয়াদাওয়ার পর মুখশুদ্ধির জন্য হাত বাড়ালেন। আগের দিনের হরীতকীর একটি খণ্ড নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন গোবিন্দ ঘোষ।

আজ আর আগের দিনের মতো দেরি হল না, মুখশুদ্ধির জন্য হাত বাড়াতেই চৈতন্যদেব একখণ্ড হরীতকী পেয়ে গেলেন।

যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন চৈতন্যদেব, গোবিন্দের মুখের দিকে তাকালেন, বললেন—কাল তুমি যখন আমাকে মুখশুদ্ধি দাও তখন অনেক দেরি হয়েছিল। আজ কেমন করে এত তাড়াতাড়ি দিলে ?

গোবিন্দ ঘোষ বললেন—প্রভু, কাল যে হরীতকী পেয়েছিলাম তার কিছু রেখে দিয়েছিলাম। আজ তাই দিলাম।

চৈতন্যদেব ঈষৎ হাসলেন। বললেন—গোবিন্দ, সঞ্চয়ের ইচ্ছা এখনও তোমার আছে, অতএব তুমি আর আমার সঙ্গে যেতে পারবে না।

গোবিন্দের মুখ শুকিয়ে গেল।

চৈতন্যদেব বললেন—গোবিন্দ, তুমি দুঃখ কোরো না। তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ আছে।

হাহাকার করে গোবিন্দ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। চৈতন্যদেব তাঁর গায়ে হাত রেখে বললেন—তুমি শান্ত হও। আমি আবার তোমার কাছে আসব আর তখন তোমাকে ছেড়ে যাব না। তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। তুমি এখানে থাকো।

অগত্যা গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে থেকে গেলেন। গঙ্গার ধারে একখানা কুটির বানিয়ে থাকেন, দিনরাত ধ্যান করেন।

একদিন। গঙ্গার ধারে বসে গোবিন্দ ধ্যান করছেন, গঙ্গার স্রোতে কী একখানা ভেসে এসে তাঁর গায়ে লাগল। ধ্যান ভেঙে গেল। মনে হল যেন একখানা পোড়া কাঠ। হয়তো শ্মশানের কাঠ। কাঠখানা তুলে গঙ্গার পাড়ে ফেলে গোবিন্দ আবার ধ্যানে বসলেন।

ধ্যান করতে-করতে মনে হল যেন চৈতন্যদেব বলছেন—গোবিন্দ, আমি আসছি। যাকে পোড়াকাঠ ভেবেছ তাকে যত্ন করে কুটিরে রেখে দাও।

কাঠখানা নিয়ে গোবিন্দ কুটিরে রেখে দিলেন।

পোড়াকাঠ ভেবে যা কুটিরে নিয়ে এসেছেন, পরদিন সকালে গোবিন্দ অবাক হয়ে দেখলেন, তা পোড়াকাঠ নয়—একখানা কালো পাথর। চৈতন্যদেব কবে আসবেন কে জানে। গোবিন্দ আশা করে রইলেন যে তিনি নিশ্চয় একদিন আসবেন।

আশা ব্যর্থ হল না।

চৈতন্যদেব একদিন গোবিন্দের কুটিরে এসে উপস্থিত। বললেন—গোবিন্দ, পাথরখানা পেয়েছ তো?

করজোড়ে গোবিন্দ বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চৈতন্যদেব রললেন—কাল এই পাথর দিয়ে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করব।

পরদিন একজন ভাস্কর এল। চৈতন্যদেবের কথায় সে ওই পাথর থেকে দেবমূর্তি বানিয়ে দিল। চৈতন্যদেব ওই দেবমূর্তির নাম রাখলেন —গোপীনাথ।

চৈতন্যদেব নিজের হাতে গোপীনাথের মূর্তি গোবিন্দের কুটিরে স্থাপন করলেন। তারপর চৈতন্যদেব বললেন—গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকে দিলাম। এই ঠাকুরের সেবা করো, আর আমার অভাবে দুঃখ পাবে না। আমি বলেছিলাম, এবার এসে আর তোমাকে ছেড়ে যাব না। এই আমি তোমার কাছে রইলাম।

কিন্তু গোবিন্দ তো গোপীনাথের জন্য ব্যাকুল নন, তিনি ব্যাকুল চৈতন্যদেবের জন্য।

গোবিন্দ কাঁদতে লাগলেন।

চৈতন্যদেব তখন গোবিন্দকে বললেন—তুমি এখানে থাকো, এই ঠাকুরের সেবা করো, বিবাহ করো। তোমাকে দিয়ে শ্রীভগবান সকলকে দেখাবেন যে তিনি ভক্তকে কত ভালোবাসেন। এই সৌভাগ্যকে তুচ্ছ মনে কোরো না।

চৈতন্যদেব বিদায় নিলেন।

আর গোপীনাথকে নিয়ে গোবিন্দ থেকে গেলেন অগ্রদ্বীপে।

চৈতন্যদেব আদেশ দিয়ে গেছেন, কিছুতেই তারঅন্যথা হতে পারে না। অতএব গোবিন্দের একটি পুত্র হল। পুত্রটিকে রেখে গোবিন্দের স্ত্রী মারা গেলেন।

নিজের শিশুপুত্রের সেবা করতে হয়, গোপীনাথের সেবা করতে হয়—গোবিন্দ নিঃশ্বাস ফেলতেও সময় পান না।

দিনের পর দিন যায়।

পুত্রের বয়স পাঁচ বছর হল।

গোবিন্দের চোখে গোপীনাথও পাঁচ বছরের শিশু। একসঙ্গে দুই শিশুর সেবা সোজা কথা নয়। গোলমাল হয়ে যায়। কখনও নিজের পুত্রকে ভাবেন গোপীনাথ, কখনও গোপীনাথকে ভাবেন নিজের পুত্র। কখনও নিজের পুত্রের জিনিস গোপীনাথকে দেন, কখনও গোপীনাথের জিনিস নিজের পুত্রকে দেন। ভুল হয়ে যায়। ফলে কখনও গোপীনাথের দুঃখ, কখনও নিজের পুত্রের দুঃখ।

এই সময়ে গোবিন্দের পুত্রটি মারা গেল।

শোকে দুঃখে অস্থির হয়ে উঠলেন গোবিন্দ। মনে-মনে ভাবলেন--কী অন্যায়! আমি দিনরাত ঠাকুরের সেবা করি আর ঠাকুর এমনি অকৃতজ্ঞ যে আমার পুত্রটি নিয়ে গেলেন।

গোবিন্দ সাব্যস্ত করলেন যে গোপীনাথের ঘরে শুয়ে উপোস করে মরবেন। মনের দুঃখে গোবিন্দ উপোস করে শুয়ে রইলেন গোপীনাথের ঘরে, পাশ পর্যন্ত ফিরলেন না। সেবা বন্ধ, অতএব গোপীনাথকে সারাদিন উপোস করে থাকতে হল। আর গোবিন্দ মনে-মনে ভাবলেন —যেমন আমার বুকে শেল হানলে তেমনি খুব হয়েছে।

রাত্রি হল। সারাদিন উপোস করে আছেন তবু গোপীনাথ তিলমাত্র রাগ করলেন না। বললেন—গোবিন্দ বাপ! ক্ষুধায় মরি। তোমার কি দয়ামায়া নেই? সারাদিন গেল, তুমি আমাকে একবিন্দু

জল পর্যন্ত দিলে না।

গোবিন্দ বললেন—আমার কি আর ক্ষমতা আছে যে তোমার সেবা করব? আমি চারদিক অন্ধকার দেখছি। আমি আর তোমার সেবা করতে পারব না।

গোপীনাথ দুঃখ করে বললেন— কারও যদি দৈবাৎ একটা ছেলে মরে তবে কি সে তার আরেক ছেলেকে উপোস করিয়ে মারে? তোমার এক পুত্র মরেছে, সেজন্য শোক করো তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমাকে কেন অনাহারে মারো?

গোবিন্দ বললেন—ঠাকুর, আমার পুত্রটি কেড়ে নিলে, তোমার একটু দয়া হল না? তুমি যে আমাকে বাপ-বাপ করছ সে তো কেবল কথার কথা।

গোপীনাথ বললেন—গোবিন্দ, এই বিপদ যে কেবল তোমার একার হল তা তো নয়। এমন বিপদে অনেকেই পড়ে। শান্ত হও। তোমার পুত্রের ভালোই হয়েছে।

গোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—ঠাকুর, সব বুঝলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পুত্রশোক দিলে কেন? আমার পুত্রটিকে কেড়ে নিতে তোমার একটু দয়া হল না?

গোপীনাথ বললেন—গোবিন্দ, তোমাকে একটি গোপন কথা বলি। যে-পিতার দুই পুত্র, আমি সে-পিতার কাছে থাকি না। তুমি পিতা, আমি ছিলাম এক পুত্র, ভালো ছিলাম। কিন্তু যখন তোমার আরেকটি পুত্র হল, তখন আমি আর থাকতে পারি না। আমি যদি যেতাম তবে তুমি হয়তো তোমার দুই পুত্রই হারাতে—আমাকেও পেতে না, আর ঐ পুত্রকেও পেতে না। গোবিন্দ, শান্ত হও, তোমার এক পুত্র গেছে কিন্তু আমি তোমার আরেক পুত্র আছি।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। গোবিন্দ বললেন—তুমি তো আমার সর্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র। কিন্তু তুমি কি পুত্রের সব কাজ করবে?

তুমি কি আমার শ্রাদ্ধ করবে ?

গোপীনাথ উত্তর দিলেন—তথাস্তু। গোবিন্দ, তুমি আমার পিতা। শ্রাদ্ধ রাজসিক কাজ। তবু পিতা হয়ে তুমি যখন নিজের মুখে আমার কাছে শ্রাদ্ধের কথা উচ্চারণ করলে তখন আমি কথা দিলাম যে শাস্ত্র-মতো তোমার শ্রাদ্ধ করব।

গোবিন্দ কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—বাপ, আমি অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করো।

বলে তখনই স্নান সেরে গোপীনাথের জন্য রান্না করতে গেলেন।

তারপর একদিন গোবিন্দের ইহলোক থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এল। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন—আমি চললাম। আমার দেহ দাহ করো না, দেবপ্রাঙ্গণের একপাশে সমাধি দিও।

লোকে বলে, গোবিন্দের মৃত্যুর পর গোপীনাথের চোখে বিন্দু-বিন্দু জল দেখা গেছে।

মৃত্যুর আগেই গোবিন্দ চমৎকার ব্যবস্থা করে গেছেন গোপীনাথের সেবার ; গোপীনাথের ভার দিয়ে গেছেন নিজের প্রধান শিষ্যর হাতে।

নতুন সেবায়েতকে গোপীনাথ রাত্রে বললেন—গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। একমাস আমার অশৌচ, আমি হবিষ্য খাব। তুমি কাল আমাকে স্নান করিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করবে।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না নতুন সেবায়েত। তবু বললেন—ঠাকুর, তুমি কি সত্যি-সত্যি আমার সঙ্গে কথা বলছ ? সত্যি যদি তুমি কথা বলে থাকো তো বলো তোমাকে আমি কোন সাহসে কাছা পরাব ? লোকে আমাকে কী বলবে ?

গোপীনাথ বললেন—আমি আমার পিতাকে কথা দিয়েছি যে তাঁর শ্রাদ্ধ করব। মাসান্তে আমি সকলের সামনে শাস্ত্রমতে সব কাজ করব, নিজের হাতে পিণ্ড দেব। তুমি আমার কথামতো সব কাজ করো,

তোমার কোনো ভয় নেই।

গোপীনাথের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিতে হল।

চৈত্রমাসের কৃষ্ণা একাদশীতে গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ। অনেকে এসেছেন। শ্রাদ্ধস্থানে গোপীনাথকে নিয়ে আসা হল—তাঁর গলায় কাছা। লোকে বলে, সেদিন সকলের সামনে গোপীনাথ নিজের হাতে গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিয়েছেন।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সদর থানায় গঙ্গার চড়ায় অগ্রদ্বীপে এখনও গোপীনাথ আছে। যুগের পর যুগ কেটে গেছে, এখনও গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুতিথিতে গোপীনাথ পিতার উদ্দেশে পিণ্ড দিয়ে যাচ্ছেন। মৃত্যুতিথির দিন কেউ মাটিতে কুশ বিছিয়ে গোপীনাথের হাতে পিণ্ড তুলে দেন; দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ পরে খুললে নাকি দেখা যায় যে সেই পিণ্ড কুশের উপর পড়ে থাকে।

ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি

বিষ্ণুপুর মহকুমা বাঁকুড়া জেলায়। বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় তেরো-মাইল পুবে ময়নাপুর। ময়নাপুরে একজন ধর্মঠাকুর আছেন।

ধর্মঠাকুরের পুজো কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ অংশে প্রধানত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। কলকাতার ধর্মতলা ষ্ট্রীট কে না চেনে? এই অঞ্চলের নাম ধর্মতলা নিতান্ত অকারণে হয়নি। অনেক পণ্ডিত মেনে নিয়েছেন ধর্মঠাকুরের নাম থেকেই অঞ্চলের নাম হয়েছে 'ধর্মতলা'। এককালে ওই অঞ্চলে মহাসমারোহে ধর্মঠাকুরের গাজন হত, মেলা বসত, পুজো চলত।

ধর্মঠাকুরের কোনও মূর্তি নেই। একখণ্ড পাথরকেই ধর্মঠাকুররূপে পুজো করা হয়। কোথাও-কোথাও পাথরের গায়ে চাঁচের টুকরো কিংবা পেতলের পেরেক লাগানো থাকে—ধর্মঠাকুরের চোখ। অধিকাংশ ধর্মঠাকুরই গোলাকার কিংবা ডিম্বাকৃতি। কালক্রমে কোনও-কোনও অঞ্চলে চালু হয়ে গেল—ধর্মঠাকুরের আকৃতি হবে কচ্ছপের মতো। একেক জায়গায় ধর্মঠাকুরের একেক রূপ। ধর্মঠাকুরের বহুরূপ। নমস্তে বহুরূপায় যশায় ধর্মরাজায়।

ধর্মঠাকুরের পুজো কিন্তু বামুনে করেন না। ওই দেবতার পুজো করেন ডোম। ডোম, কিন্তু তাঁদের পদবী পণ্ডিত। ডোম হয়েও তাঁরা

আলাদা। পণ্ডিত ডোমেরা অন্য ডোমের বাড়িতে জলগ্রহণ করেন না।

তাম্রদীক্ষা না হলে কোনও ডোম ধর্মঠাকুরের পুরোহিত হতে পারেন না। তাম্রদীক্ষা হলে ডোমের বাহুতে থাকবে তামার তাগা, হাতে থাকবে তামার আংটি। ইচ্ছা করলেই যে কোনও ডোমের তাম্রদীক্ষা হবে না। রামাই পণ্ডিতের বংশে না জন্মালে কেউ তাম্রদীক্ষা নিতে পারেন না, পণ্ডিত হতে পারেন না, ধর্মঠাকুরের পুজো করতে পারেন না। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত।

ভক্তদের অবস্থা সচ্ছল না হলে বারোয়ারি ধর্মঠাকুরের সাধারণত নিত্যপুজো হয় না। গৃহস্থের বাড়ির ধর্মঠাকুরের অবশ্য নিত্যপুজো হয়, সেখানে সাধারণত বার্ষিক পুজোর বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নেই। বারোয়ারি ধর্মঠাকুরের বার্ষিক পুজোয় মস্ত ঘটা হয়।

চৈত্র থেকে আষাঢ় মাস অর্থাৎ অনাবৃষ্টির কালের মধ্যেই মহা-সমারোহে বার্ষিক পুজো হয়। বার্ষিক পুজো হয় চৈত্র থেকে আষাঢ়ের যে কোনও পূর্ণিমায়। সবচেয়ে বেশি বার্ষিক পুজো হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়।

বার্ষিক পুজোর আগে ধর্মঠাকুরকে স্নান করাতে হয়। মস্ত উৎসব।

ধর্মঠাকুর যুদ্ধের দেবতা। একজন অনার্য দেবতা।

বলি ছাড়া ধর্মঠাকুরের পুজো হয় না। বলি দেওয়া হয় শুয়োর, মুরগি, পাঁঠা, হাঁস, কবুতর।

ভক্তদের বিশ্বাস—ধর্মঠাকুরের দয়ায় সন্তানহীনার সন্তান হয়, ধর্মঠাকুরের দয়ায় চোখের অসুখ সেরে যায়, ধর্মঠাকুরের শাপে পাপিষ্ঠের কুষ্ঠ হয়, সাদা রঙের উপহার পেলে ধর্মঠাকুর তুষ্ট থাকেন, মাটির ঘোড়া উপহার পেলে ধর্মঠাকুর তৃপ্ত হন, ধর্মঠাকুরের কাছে 'বারো' সংখ্যাটি প্রিয়।

একটা ডিম ভেঙে ধর্মঠাকুরের জন্ম হল। কোথাও কেউ নেই,

শূন্য আর শূন্য, ধর্মঠাকুর একা। ধর্মঠাকুরের নিঃশ্বাস থেকে তারপর উলুক পাখির জন্ম হল। সেই উলুক পাখির পিঠে চড়ে ধর্মঠাকুর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোথাও কেউ নেই। কোথাও কিছু নেই।

ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেল উলুক পাখি। খুব পিপাসা পেল। জল চাই। উলুক পাখি জল চাইল ধর্মঠাকুরের কাছে। কিন্তু কোথায় জল?

ধর্মঠাকুর তখন নিজের থুতু দিলেন উলুক পাখিকে। পিপাসা মিটুক। কিন্তু এককণা থুতু পড়ল বাইরে। ফলে জগৎ-সংসার জলে ডেসে গেল। ধর্মঠাকুর, উলুক পাখির সঙ্গে, জলে ভাসতে লাগলেন।

ধর্মঠাকুর তখন একবিন্দু গায়ের ময়লা ফেলে দিলেন। ফলে পৃথিবীর সৃষ্টি হল। তারপর ত্রিভুবন সৃষ্টি করে ফেললেন ধর্মঠাকুর। অনেককাল পরের কথা। ধর্মঠাকুরের ইচ্ছে হল মর্ত্য থেকে পুজো নেবেন। কিন্তু কার হাত থেকে প্রথম পুজো নেবেন?

জানপুরে থাকেন রামাই পণ্ডিত। রামাই পণ্ডিতের পইতে নেই। রামাই পণ্ডিতের মামার নাম মার্কণ্ডেয়। মার্কণ্ডেয়র চাপে পড়ে মুনিরা একঘরে করে রেখেছেন রামাই পণ্ডিতকে। এই রামাই পণ্ডিতের হাত থেকেই ধর্মঠাকুর পুজো নেবেন। ধর্মঠাকুর স্বয়ং রামাই পণ্ডিতকে তাম্র-উপবীত দিলেন, ধর্মঠাকুর স্বয়ং রামাই পণ্ডিতকে নিজের পূজারী করলেন। ধর্মঠাকুরের শাপে মার্কণ্ডেয়র হল কুষ্ঠ। ধর্মঠাকুরের পুজো করে মার্কণ্ডেয় অবশ্যি শেষ পর্যন্ত নিস্তার পেলেন।

মুনিদের পুজোয় সুখ হল না। ধর্মঠাকুর তারপর দয়া করলেন সদাডোমকে।

ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে ধর্মঠাকুর একদিন একটা ছাতা সারানোর অছিলায় সদাডোমের কুঁড়েঘরে গিয়ে হাজির হলেন। সদাডোম খুব যত্ন করে ছাতাটি সারিয়ে দিল। তখন ব্রহ্মচারী বললেন—আমার একাদশীর

পারণ চাই।

সদাডোম সাধ্যমতো আয়োজন করল। তখন ব্রহ্মচারী বললেন—যাদের সন্তান নেই তাদের ঘরে আমি খাই না। সদাডোমকে পুত্রবর দিয়ে গেলেন ব্রহ্মচারী।

বলে গেলেন—বারো বছর বাদে এসে আমি একাদশীর পারণ করব। দিন যায়। দিনের পর দিন যায়।

ব্রহ্মচারীর বর ফলে গেল। ছেলে হল সদাডোমের।

বারো বছর বাদে ব্রহ্মচারী সদাডোমের কাছে এসে উপস্থিত। ব্রহ্মচারী তো ছদ্মবেশী ধর্মঠাকুর।

ধর্মঠাকুরের দয়ায় সদাডোম রামাই পণ্ডিতকে পুরোহিত করে ধর্মঠাকুরের পুজো করলেন।

আবার ময়নাপুরে ফিরে যাওয়া যাক।

ময়নাপুরে যে ধর্মঠাকুর আছেন তাঁর নাম যাত্রাসিদ্ধি। সকলেই মানে যাত্রাসিদ্ধিকে। যাত্রাসিদ্ধির খুব নামডাক। যাত্রাসিদ্ধি জাগ্রত দেবতা।

ময়নাপুরের কিছু উত্তরে দ্বারিকেশ্বর নদীর তীরে চাঁপাতলার ঘাট। ধর্মঠাকুরের ভক্তদের কাছে পুণ্যতীর্থ এই ঘাট। যাত্রাসিদ্ধির গাজনের সময় হাজার-হাজার তীর্থযাত্রী চাঁপাতলার ঘাটে এসে পুণ্যস্নান করেন।

যাত্রাসিদ্ধি কেমন করে ময়নাপুরে এত বিখ্যাত হলেন? যশাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পুজো করতেন। সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তিনি।

যশাই পণ্ডিত একদিন একটা কাণ্ড করেছেন।

যশাই পণ্ডিত একদিন সমস্ত ঠাকুর এনে জমা করলেন। চারদিকে রটে গেল—যশাই পণ্ডিত কী একটা কাণ্ড করবেন, যশাই পণ্ডিত সমস্ত ঠাকুর এনে এক জায়গায় জড় করেছেন।

চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এল ময়নাপুরে। যশাই পণ্ডিত কী

কাণ্ড করবেন কে জানে।

সমস্ত ঠাকুর নিয়ে যশাই পণ্ডিত একটা মস্ত পুকুরের ধারে এলেন। একেক করে সমস্ত ঠাকুর সজোরে ছুঁড়ে ফেললেন পুকুরের গভীর জলে। ঠাকুর জলের তলায় ডুবে গেল।

এ কী করলেন যশাই পণ্ডিত! সমস্ত লোক হা হয়ে রইল।

যশাই পণ্ডিত বললেন—আমি সমস্ত ঠাকুর জলে ফেলে দিয়েছি। এখন, আপনারা দেখুন, আমি পুকুরের পাড়ে বসে জলে হাত পেতে প্রত্যেক ঠাকুরের নাম ধরে ডাকব। যিনি জ্যান্ত ঠাকুর, তিনি জল থেকে নিজেই আমার হাতে উঠে আসবেন।

লোকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল। শুনতে লাগল। যশাই পণ্ডিত নাম ধরে ডেকে যাচ্ছেন।

ডাক শুনে সত্যি-সত্যি একজন ঠাকুর পুকুরের জল থেকে উঠে এলেন যশাই পণ্ডিতের হাতে। এই ঠাকুরের নাম যাত্রাসিদ্ধি।

যশাই পণ্ডিত রাগ করলেন। এতকাল যশাই পণ্ডিত তো যাত্রা-সিদ্ধির পুজো করেনি, তিনি এতকাল যে-ঠাকুরের পুজো করেছেন তাঁর নাম বাঁকুড়া রায়। কিন্তু, কই, বাঁকুড়া রায় তো যশাই পণ্ডিতের ডাকে সাড়া দিলেন না, পুকুরের জল থেকে যশাই পণ্ডিতের হাতে উঠে এলেন না। হায়, এতকাল যশাই পণ্ডিত তবে কাকে পুজো করলেন?

রাগ করে যশাই পণ্ডিত বারংবার বাঁকুড়া রায়কে ডাকতে লাগলেন। ডাকতে-ডাকতে ডাকতে-ডাকতে বাঁকুড়া রায় জলের ধারে এসে দেখা দিলেন, কিন্তু যশাই পণ্ডিতের হাতে উঠে এলেন না।

আরও রেগে গেলেন যশাই পণ্ডিত। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না। একগাছা লাঠি দিয়ে যশাই পণ্ডিত মারতে লাগলেন বাঁকুড়া রায়কে। মারের চোটে বাঁকুড়া রায়ের ছোট-ছোট দু খানা পা ভেঙে গেল, শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল।

বাঁকুড়া রায়কে পুকুরের জলেই ফেলে রেখে এলেন যশাই পণ্ডিত।

এতদিন যাঁকে পুজো করেছেন তাঁকে বিদায় দিলেন পুকুরের জলে। নিয়ে এলেন যাত্রাসিদ্ধিকে। যাত্রাসিদ্ধি ডাকে সাড়া দিয়েছেন। যাত্রাসিদ্ধি জাগ্রত দেবতা।

তারপর থেকে যশাই পণ্ডিত যাত্রাসিদ্ধিরই পুজো করেছেন।

রামাই পণ্ডিত যাই বলুন, যশাই পণ্ডিত কিন্তু বামুনদের খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। মৃত্যুর আগে যশাই পণ্ডিত বললেন—মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে পুড়িও না। ধর্মঠাকুরেব মন্দিরের সামনে আমার মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রেখ। আমার উপর দিয়ে বামুনেরা যাত্রাসিদ্ধির মন্দিবে যাবেন, তাতেই আমি তাঁদের পায়ের ধুলো পেয়ে কৃতার্থ হব।

তাই হয়েছে। মৃত্যুর পর যশাই পণ্ডিত শুয়ে আছেন যাত্রাসিদ্ধির মন্দিবের সামনে, মাটির নিচে।

যশাই পণ্ডিতের হাতে অনেক ধর্মঠাকুর পুকুরের জলে ডুবেছিলেন। যশাই পণ্ডিতেব মৃত্যুর পর একবাব ওই পুকুরের জল থেকে অনেক ধর্মঠাকুরকে উদ্ধার করা হল। সকলের চেহারা কচ্ছপের মতো। শেষ পর্যন্ত তাঁরাও আশ্রয় পেলেন যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরে। আশ্রিত ধর্ম-ঠাকুরদের মধ্যে যশাই পণ্ডিতের হাতে পা ভাঙা বাঁকুড়া রায়ও আছেন।

কালাপাহাড়

সুলেমান কররানী বাঙলার সুলতান হয়েছেন ১৫৬৫ সালে।

সুলতান একদিন উজিরকে ডাকলেন। বললেন—কাকে রাজধানীর ফৌজদার করা যায়?

উজির যাঁর নাম করলেন সুলতান তাঁকে পছন্দ করলেন না। বললেন - যুদ্ধে উনি সকলের আগে পালিয়ে যান। অমন মানুষকে আমি গৌড়ের ফৌজদার করতে পারি না। নয়ান রায়ের কথা আপনার মনে আছে?

উজির বললেন—মনে আছে। কিন্তু নয়ান রায় মারা গেছেন।

সুলতান বললেন—জানি। শুনেছি তাঁর একজন যোগ্য পুত্র আছে। সেই পুত্রের কথা কেউ জানেন?

দরবারে একজন মৌলবি ছিলেন। তিনি সুলতানকে কুর্নিশ করে বললেন—নয়ান রায়ের পুত্র কালাচাঁদ রায় আমার কাছে ফারসি পড়েছে। তার ডাক নাম রাজু। মস্ত বীর। তাঁর মতো সওয়ার আর তীরন্দাজ সচরাচর দেখা যায় না।

সুলতান খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তাঁর স্বভাব-চরিত্র কেমন?

মৌলবি সাহেব বললেন—বাপকা বেটা, কালাচাঁদ নেমকহারামি

জানে না। খুব ধার্মিক।

সুলতান তখন উজিরকে বললেন—এই কালাচাঁদকেই রাজধানীর ফৌজদার করব ভেবেছি। আপনি কী বলেন?

উজির সসম্ভ্রমে বললেন—শাহানশাহ ঠিক মানুষটিকেই বেছে নিয়েছেন। কালাচাঁদ অবশ্যই রাজধানীর ফৌজদার হওয়ার যোগ্য।

সুলতান বললেন—তবে আর দেরি কেন। আমার জরুরি পরোয়ানা দিয়ে এখনই কালাচাঁদের কাছে সওয়ার পাঠিয়ে দিন।

জরুরি পরোয়ানা নিয়ে সওয়ার ছুটল বীরজাওনের দিকে। বীরজাওন গ্রামে কালাচাঁদের বাড়ি।

স্বয়ং বাদশাহের জরুরি পরোয়ানা। কালাচাঁদ মাকে বললেন—মা, বাদশাহ আমাকে গৌড়ে ডেকে পাঠিয়েছেন।

মা বললেন—বাছা, বাদশাহের হুকুম এসেছে যখন, যেতেই হবে। যাও।

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে কালাচাঁদ চললেন গৌড়ের দিকে।

সময় মতো হাজির হলেন বাদশাহের দরবারে।

কালাচাঁদকে দেখেই সন্তুষ্ট হলেন বাদশাহ। যেমন শুনেছিলেন তেমনি দেখলেন। বাদশাহ বললেন—তোমাকে কেন ডেকে এনেছি জানো?

কালাচাঁদ কিছুই জানেন না। হুকুম পেয়ে ছুটে এসেছেন দরবারে।

বাদশাহ বললেন—আজ থেকে তুমি গৌড়ের ফৌজদার। উজিরের কাছ থেকে তোমার কাজ বুঝে নাও।

কালাচাঁদ গৌড়ের ফৌজদার হলেন। গৌড়ের ফৌজদার হওয়া সোজা কথা নয়।

রাজপ্রাসাদের কাছেই ফৌজদারের আস্তানা। অদূরে নদী।

প্রত্যহ সকালে নদীতে স্নান করতে যান কালাচাঁদ। স্নান সেরে

হাঁটা পথে গঙ্গাস্তব করতে করতে ফিরে আসেন নিজের আস্তানায়। হাতে থাকে সোনার কোশা, সঙ্গে থাকে ছাতাবরদার। তখন কালাচাঁদের পরনে থাকে দামি গরদ। চমৎকার ফরসা চেহারা, মাথায় ঘন চুল, গলায় ধবধবে পৈতে—লোকে মুগ্ধ হয়ে কালাচাঁদকে দেখে, মুগ্ধ হয়ে শোনে কালাচাঁদের মুখের সুন্দব গঙ্গাস্তব। পুজো সেরে দরবারী পোশাক পরে দরবারে যান। সেসময়ে আগে বরকন্দাজ, মধ্যিখানে ঘোড়ায় বা পালকিতে ফৌজদার কালাচাঁদ রায়, পিছনে ঘোড়সওয়ার সৈন্য।

দিনেব পব দিন যায়।

কালাচাঁদের প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ।

রাজপ্রাসাদ থেকে বাদশাহের মেয়ে দুলালী দিনের পর দিন দেখেছেন কালাচাঁদকে। দিনের পর দিন দেখে-দেখে দুলালী মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে এই কালাচাঁদ রায়ই তাঁর বর হবেন। রূপকথার কোনো কোনো রাজকন্যা যেমন নিজের বর নিজেই মনে মনে ঠিক করে রাখে।

দুলালীর মনের কথা জানতে বাকি রইল না বেগমসাহেবার। আর বেগমসাহেবার মুখ থেকে শুনলেন বাদশাহ সুলেমান কররানী।

একদিন বাদশাহ নির্জনে ডেকে আনলেন কালাচাঁদকে। বললেন—তুমি শাহজাদী দুলালীর কথা জানো?

—নাম শুনেছি। কখনও চোখে দেখিনি।

বাদশাহ বললেন—আমার আদেশ, তুমি শাহজাদীকে বিবাহ করো।

কালাচাঁদ কুর্নিশ করে বললেন—জাহাঁপনা, আমি কেমন করে শাহজাদীকে বিবাহ করব? আমি শাহজাদীকে বিবাহ করলে আমার জাত যাবে। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ।

বাদশাহ বললেন—আমি তো তোমাকে মুসলমান হতে বলিনি।

তুমি যেমন আছ তেমনি থেকে শাহজাদীকে বিবাহ করো।

কালাচাঁদ বললেন—হিন্দুসমাজ তা মানবে? অসম্ভব। আমার জাত যাবে, ধর্ম যাবে।

বাদশাহ রাগে অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন—কালাচাঁদ' জানো আমি কে?

কালাচাঁদ বিনয় করে বললেন—জানি। হুজুর বাঙলার বাদশাহ, অধীনের জানপ্রাণের মালিক।

বাদশাহ বললেন—আমার আদেশ অমান্য করলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে কালাচাঁদ বললেন—প্রাণ যায় যাক। কিন্তু আমার জাত থাক, আমার ধর্ম থাক।

বাদশাহের হুকুমে বন্দী করা হল কালাচাঁদকে। বাদশাহের হুকুম—কাল কালাচাঁদের প্রাণদণ্ড।

পরদিন সকালে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হল কালাচাঁদকে। শেষ-মুহূর্তের আর বুঝি বাকি নেই।

কিন্তু এ কী আশ্চর্য কাণ্ড, পাগলের মতো ছুটতে-ছুটতে সেখানে এসে উপস্থিত দুলালী। কী রূপ! যারা চিনত না তাবা ভাবল কে এই স্বর্গের দেবী? যারা চিনত তারা চিৎকার করে উঠল—শাহজাদী, শাহজাদী।

দুলালী নির্ভয়ে বললেন—আমার প্রাণ থাকতে কেউ ফৌজদারের গায়ে হাত দিতে পারবে না। আগে আমাকে মেরে তারপর ফৌজদারকে মারতে হবে।

কালাচাঁদ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন দুলালীর মুখের দিকে। তাঁকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণ যে বলি দিতে রাজি সে তো সামান্য মেয়ে নয়। চোখের পলকে কালাচাঁদের মন আরেক রকম হয়ে গেল। এই মেয়েকে বিবাহ করলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে? বরং কালাচাঁদের

মনে হল এই মেয়েকে বিবাহ না করলে জাত থাকবে না, ধর্ম থাকবে না।

খবর পেয়ে সুলেমান কররানী ছুটে এলেন তরবারি হাতে নিয়ে।

কিন্তু কালাচাঁদ তখন নির্ভয়। বললেন—বাদশাহ, এই শাহজাদী আমার ধর্মপত্নী।

বিবাহের পর কালাচাঁদ আর ফৌজদার রইলেন না, সেনাপতি হলেন।

সেনাপতির নতুন আস্তানা। দুলালীকে নিয়ে কালাচাঁদ নতুন আস্তানার বাসিন্দা হলেন।

কালাচাঁদ বাদশাহের জামাতা হয়েছেন, সেনাপতি হয়েছেন; কিন্তু নিজের ধর্মকর্ম ছাড়েননি। আগের মতোই তিনি প্রত্যহ সকালে নদীতে স্নান করতে যান, স্নান সেরে হাঁটাপথে গঙ্গাস্তব করতে করতে ফিরে আসেন নিজের আস্তানায়, হাতে থাকে সোনার কোশা, পরনে থাকে দামী গরদ, গলায় ধবধবে পৈতে।

কিন্তু বীরজাওনে রটে গেছে যে গ্রামের ছেলে কালাচাঁদ শাহজাদীকে বিবাহ করে মুসলমান হয়েছেন। গ্রামের পণ্ডিতেরা একঘরে করে দিলেন তাঁকে।

কালাচাঁদের মা উত্যক্ত হয়ে বললেন—কালাচাঁদ মন্দ কাজ করতে পারে না। সে যদি ভালো বুঝে বাদশাহের মেয়েকে বিয়ে করে থাকে তো বেশ করেছে। তা নিয়ে লোকজনের এত মাথাব্যথা কেন?

বীরজাওন থেকে খবর গেল যে মা কালাচাঁদকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছে। কালাচাঁদ খবর পেল যে মা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হননি; তাঁর উপর মায়ের আস্থা অটুট আছে।

কালাচাঁদ সাব্যস্ত করলেন এবার বীরজাওনে তিনি দুলালীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না।

দুলালী আপত্তি করে বললেন—আমি মাকে দেখতে যাব না?

কালাচাঁদ বললেন—এবার আমি একাই যাই। সময় হলে তোমাকে নিয়ে যাব।

বীরজাওনে এসে কালাচাঁদ জানলেন যে গ্রামে তিনি একঘরে। কিন্তু মা সব শুনে অভয় দিয়ে বললেন—তুমি মানুষের মতো কাজ করেছ। এমন মেয়েকে বিবাহ না করলে তোমার অধর্ম হত। ভালো কাজ করলে কি কারও জাতধর্ম যায়? যায় না। তবে পণ্ডিতদের জানো তো, তাঁদের চক্রান্তে হয়তো তোমাকে কিছু দুঃখকষ্ট পেতে হবে।

যে যাই বলুক, পণ্ডিতদের চক্রান্তে একঘরে হয়ে রইলেন কালাচাঁদ। একঘরে থাকলে লাঞ্ছনা—অপমানের জ্বালা দুঃসহ হয়ে ওঠে।

অপরাধ না করেও কি তাঁকে চিরদিন একঘরে হয়ে থাকতে হবে? পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন—পুরীর জগন্নাথদেব যদি আদেশ দেন তো কালাচাঁদকে আর একঘরে হয়ে থাকতে হবে না।

কালাচাঁদ চলে এলেন পুরীতে। কিন্তু পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রের ফলে পাণ্ডাদের কাছে তিনি অপরাধী হয়ে আছেন। পাণ্ডারা তাঁকে মন্দিরে ঢুকতে দিল না।

কালাচাঁদ অগত্যা মন্দিরের বাইরে জগন্নাথের কাছে ধরনা দিলেন। প্রার্থনা করলেন—প্রভু, তুমি অন্তর্যামী, তুমি সব জানো। পণ্ডিতেরা আমাকে বিনাদোষে একঘরে করেছে, লাঞ্ছনা-অপমানের জ্বালা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। শুনেছি, তুমি অগতির গতি, তোমার কাছে সকলে সমান। তুমি আমাকে উদ্ধার করো।

মন্দিরের বাইরে চোখ বুজে কালাচাঁদ অনাহারে সাতদিন ধরনা দিয়ে রইলেন। কিন্তু কোনো দৈব আদেশ পেলেন না। সাতদিন পর উঠে বসলেন। রাগে ও অপমানে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে জগন্নাথকে বললেন—তুমি দেবতা নও, তুমি

কাঠের পুতুল। ভক্তেরা তোমার মিথ্যা মহিমা রটিয়ে বেড়ায়। তুমি যদি দেবতা হতে তো বিনাদোষে আমাকে লাঞ্ছনা-অপমানের জ্বালা সইতে হত না, তোমার দরজায় সাতদিন আমাকে অনাহারে ধরনা দিয়ে থাকতে দিতে না। তুমি কাঠের পুতুল, আর কিছু নও। আমার প্রতিজ্ঞা—মন্দিরে-মন্দিরে তোমার মতো কাঠ, মাটি ও পাথরের যত মূর্তি আছে, সব আমি নিশ্চিহ্ন করে ছাড়ব।

কালাচাঁদ তখন রুদ্রমূর্তি। ফিরে এলেন রাজধানীতে। আর হিন্দু রইলেন না, মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিলেন। নতুন নাম হল—কালাপাহাড়।

সুলেমান কররানীর আদেশ নিয়ে বিস্তর সৈন্যসমেত কালাপাহাড় চললেন উড়িষ্যার দিকে। পথে তমলুকে বর্গভীমাদেবীর বিখ্যাত মন্দির। বর্গভীমাদেবীর মূর্তি দেখে কালাপাহাড়, কেন কে জানে, মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি এই দেবীমূর্তি ও মন্দিরের তিলমাত্র ক্ষতি করেননি। বরং ফারসিতে একখানা দলিল লিখে দিয়ে গেছেন। দলিলখানা শোনা যায়, এখনও আছে বর্গভীমাদেবীর পূজারীদের কাছে। এই দলিলখানার নাম—বাদশাহী পাঞ্জা।

কালাপাহাড়ের কাহিনীতে বর্গভীমাদেবীর অধ্যায় আজও পরম বিস্ময় হয়ে আছে।

কালাপাহাড় পুরীর মন্দির লুণ্ঠন করলেন ১৫৬৮ সালে। পাণ্ডারা জগন্নাথদেবের মূর্তি নিয়ে চিল্কা হ্রদের কাছে পারিকুদে একটি গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। খবর গোপন রইল না কালাপাহাড়ের কাছে। গর্ত থেকে সেই মূর্তি বের করে কালাপাহাড় টেনে নিয়ে এলেন, আগুনে পুড়িয়ে জলে ফেলে দিলেন।

পুবে আসাম, পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে উড়িষ্যায় বিস্তর বিখ্যাত মন্দির; কালাপাহাড় কোনো-কোনো মন্দিরের অংশবিশেষ ধ্বংস করেছেন, কোনো-কোনো মন্দির পুরোপুরি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন।

কালাপাহাড়ের কাড়ানাকড়া বাজলে, লোকে বলে, সকল দেবমূর্তি কম্পিত হত। কালাপাহাড় সর্বনাশী নৃশংস অত্যাচারী।

১৫৭২ সালে সুলেমান কররানীর মৃত্যু হয়েছে। তারপর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কয়েজিদ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। অল্পকাল পর তিনি নিহত হয়েছেন।

তারপর সুলতান হয়েছেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দায়ুদ কররানী। কালাপাহাড়, বলে রাখা ভালো, দায়ুদ কররানীর সেনাপতি। ইতিহাসে পাওয়া যায় মোগল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে কালাপাহাড় নিহত হয়েছেন ১৫৮৩ সালে।

কিন্তু লোকে সেকথা মানে না। কালাপাহাড় জগন্নাথদেবের মূর্তি আগুনে পুড়িয়ে জলে ফেলে দিয়েছেন, মনে আছে? সেই পাপে, লোকে বলে, কালাপাহাড়ের হাত-পা খসে গেছে—কালাপাহাড় মরেছেন।

বউঠাকুরানীর হাট

বউঠাকুরানীর হাট নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক কিংবদন্তী আছে। এই কিংবদন্তীর মধ্যে, যতদূর জানি, ঐতিহাসিক সত্যের অংশ হয়তো নিতান্ত নগণ্য নয়। এবং প্রতাপাদিত্যের নাম এই কিংবদন্তীর সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। অতএব প্রতাপাদিত্য থেকে আরম্ভ করাই ভালো।

সম্ভবত ১৫৬০ সালে গৌড়ে প্রতাপের জন্ম। প্রতাপের বাবার নাম শ্রীহরি। প্রতাপের বয়স যখন পাঁচদিন তখন তার মা মারা গেলেন। প্রতাপের কুষ্ঠি বিচার করে একজন গণকঠাকুর বলেছেন—এই বালক পিতৃহন্তা হবে।

গণকঠাকুরের কথা শ্রীহরি ষোলো আনা বিশ্বাস করেছেন। কোনো-দিনই প্রতাপকে সুনজরে দেখেননি।

শ্রীহরির খুড়তুতো ভাইয়ের নাম জানকীবল্লভ। দুই ভাইরের মধ্যে এত ভালোবাসা যে একজনকে না হলে আরেকজনের চলে না।

শ্রীহরির কাছে আদর-যত্ন না পেলেও জানকীবল্লভের কাছে অপার স্নেহমমতা পেয়েছে প্রতাপ। জানকীবল্লভের পত্নীর আদর-যত্নেই প্রতাপ বড় হয়ে উঠেছে, নিজের মায়ের অভাব ঘুণাক্ষরেও সে টের পায়নি। স্নেহমমতা প্রতাপ নিজের বাবার কাছে পায়নি, পেয়েছে

জানকীবল্লভের পত্নীর কাছে। স্নেহযত্নের হিসেবে জানকীবল্লভের পত্নীই প্রতাপের মা, জানকীবল্লভই প্রতাপের বাবা। কিন্তু, কেন কে জানে, প্রতাপ চিরদিনই জানকীবল্লভকে সন্দেহের চোখে দেখেছে।

দাউদ খাঁ কররানী বাঙলার শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান। ১৫৭২ সাল থেকে দাউদ খাঁ বছর চারেক রাজত্ব করেছেন। শ্রীহরি এই সুলতানেব মন্ত্রী। জানকীবল্লভ এই সুলতানের একজন প্রধান কর্মচারী। দাউদ খাঁ শ্রীহরিকে 'বিক্রমাদিত্য' ও জানকীবল্লভকে 'বসন্ত রায়' খেতাব দিয়েছেন।

যশোব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৫৭৪ সালে।

১৫৭৭ সালে বিক্রমাদিত্য যশোবেব রাজা হয়েছেন ; সেই উপলক্ষে নতুন রাজধানীতে কত উৎসব। বলা বাহুল্য, বিক্রমাদিত্য মোগল বাদশাহের সামন্তরাজ হয়েছেন, যশোর রাজ্যেব বাদশাহী সনদ পেয়েছেন। বিক্রমাদিত্য রাজা বটে, কিন্তু বসন্ত রায়ই সর্বেসর্বা। তিনিই সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দুষ্টের দমন ও শিষ্টেব পালনে তিনি তুলনাহীন।

ছেলেবেলায় প্রতাপ যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ। বয়স যত বেড়েছে প্রতাপ ততই উদ্ধত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মেধাবী ছেলে। সংস্কৃত, ফারসি ও বাঙলা শিখেছে। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে আর টান নেই। কলমের চেয়ে তরবারিই তার বেশি পছন্দ। প্রতাপ তীর ছুঁড়ে কম পাখি মারেনি। শুধু পাখি মেরেই সে ক্ষান্ত হয়নি, বনে-জঙ্গলেও শিকার করেছে বিস্তর হিংস্র জন্তু। প্রতাপ অনেকের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছে। কিন্তু এ-বিষয়ে তার সবচেয়ে বড় শিক্ষক স্বয়ং বসন্ত রায়। তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হয়েছে প্রতাপ। গুরু বুঝেছেন যে যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর শিষ্য নিপুণ।

আশ্চর্য মানুষ এই বসন্ত রায়। যেমন বিদ্বান তেমনি গান-বাজনায় ওস্তাদ। ভক্ত। রসিক। রাজকার্যে দক্ষ। এই সৌম্যশান্ত মানুষটির

মুখে সকল সময়ে হাসি। অথচ অসমসাহসী ও অসাধারণ যোদ্ধা। সকলে জানে যশোর রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা; তাঁরই দক্ষতায় যশোর রাজ্যের গৌরব বেড়েছে। মনে রাখা ভালো, বসন্ত রায়ই যশোর রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করে নাম রেখেছেন—যশোহর।

বিক্রমাদিত্য একদিন বসন্ত রায়কে বললেন—কিছু দিনের জন্য প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাতে হবে। সেখানে ভারতবর্ষের রাজধানীর যুদ্ধসজ্জা, সৈন্যবাহিনী ও আদব-কায়দা দেখলে প্রতাপ অনেক কিছু শিখতে পারবে।

কোথায় যশোহর আর কোথায় আগ্রা। প্রতাপ অত দূর দেশে গিয়ে থাকবে? বসন্ত রায় আপত্তি করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বিক্রমাদিত্যের কথায় রাজী হতে হল। আর প্রতাপ ভেবে নিল যে বসন্ত রায়েব চক্রান্তেই তার এই দূব দেশে নির্বাসনের ব্যবস্থা।

বসন্ত রায়ের চিঠি নিয়ে প্রতাপ, ১৫৭৮ সালের শেষ দিকে, আগ্রার দরবারে উপস্থিত হল টোডরমল্লের কাছে। ভারতবর্ষের বাদশাহ তখন আকবর। অধিকাংশ সময় তিনি থাকেন নতুন রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে। সম্ভবত প্রতাপ আগ্রা থেকে টোডরমল্লের সঙ্গে ফতেপুর সিক্রিতে গিয়ে আকবব বাদশাহের সঙ্গে দেখা করেছে।

আকবর বাদশাহের সুনজরে পড়েছে প্রতাপ।

প্রতাপ বহু দিন এই ভান বজায় রেখেছে যে সে মোগলের অনুগত। কিন্তু মনে-মনে তার চিবদিন প্রতিজ্ঞা যে সে স্বদেশকে মোগলের কবল থেকে উদ্ধার করবে। স্বদেশে গিয়ে রাজতক্তে বসতে না পারলে মোগলের কবল থেকে উদ্ধারের আশা নেই। কেমন করে স্বদেশে গিয়ে রাজতক্তে বসা যায়?

সামান্য একটু কৌশলে প্রতাপের ইচ্ছা পূর্ণ হল।

প্রতাপ আগ্রায় আসার পর বসন্ত রায় বাদশাহের রাজস্ব পাঠাতেন প্রতাপের কাছে। কৌশল করে প্রতাপ কয়েক কিস্তি রাজস্ব সরকারে

জমা দিল না। সুযোগ বুঝে প্রতাপ একদিন বাদশাহের কাছে নিবেদন করল —যশোরে ঠিকমতো রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। বাদশাহ যদি দয়া করে আমাকে যশোরের সামন্তরাজ করে সনদ দেন তো আমি বাকি রাজস্ব শোধ দেব, চিরদিন মোগলের বাধ্য থাকব।

বাদশাহ বিশ্বাস করলেন প্রতাপের কথা। যশোর রাজ্যের সনদ লিখে দিলেন প্রতাপের নামে। বাদশাহী সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রতাপ ফিরে এল যশোরে, হঠাৎ অবরোধ করল যশোরদুর্গ—১৫৮২ সালের কথা।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় কি যুদ্ধে নামবেন, দমন করবেন বিদ্রোহী প্রতাপকে? কিন্তু কোনো যুদ্ধ হল না। বিক্রমাদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত রায় একদিন উপস্থিত হলেন প্রতাপের শিবিরে। বললেন—প্রতাপ, তোমার কাজে আমরা বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইনি, বরং সন্তুষ্ট হয়েছি, কারণ আমাদের জরাজীর্ণ শরীরে রাজত্ব করবার বয়স আর নেই। তুমি বাদশাহী সনদ এনেছ—ভালো করেছ। তোমার বাবার মৃত্যুর পর নতুন করে আর বাদশাহী সনদ আনতে হবে না। বাদশাহ তোমাকে সুনজরে দেখেছেন জেনে এ-রাজ্যের লোকজন ধন্য হয়েছে।

প্রতাপ শান্ত হল। সকল সমস্যার চমৎকার সমাধান হয়ে গেল।

বসন্ত রায়ের পুত্রদের মধ্যে গোবিন্দকে প্রতাপ সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে। গোবিন্দ যেন প্রতাপের দু চোখের বিষ। বলা বাহুল্য, গোবিন্দও বিন্দুমাত্র পছন্দ করে না প্রতাপকে আর, কেন কে জানে, আগেই বলা হয়েছে, প্রতাপ চিরদিনই বসন্ত রায়কে সন্দেহের চোখে দেখেছে। বসন্ত রায় কিংবা তাঁর পুত্রদের সঙ্গে মিলেমিশে প্রতাপ রাজ্য চালাবে—এমন আশা করা যায় না।

অনেক ভেবেচিন্তে বিক্রমাদিত্য নিজের রাজ্যকে দুভাগে ভাগ করলেন—দশ আনা দিলেন প্রতাপকে ছ-আনা দিলেন বসন্ত রায়কে। কালিন্দী থেকে মধুমতী পর্যন্ত পূর্বদিক পড়ল প্রতাপের ভাগে আর

বসন্ত রায়ের ভাগে পড়ল কালিন্দী থেকে ভাগীরথী পর্যন্ত পশ্চিমদিক। আপাতত দুভাগেরই রাজধানী রইল—যশোহর।

কিন্তু প্রতাপের ইচ্ছা নয় যে দুভাগের রাজধানী একই জায়গায় থাকে। যমুনা ও ইছামতী নদী যেখানে মিলেছে সেখানে প্রতাপের নতুন রাজধানী গড়ে উঠতে লাগল। জায়গাটার নাম ধুমঘাট। এখানে বলা দরকার, বসন্ত রায় কখনও-কখনও প্রতাপের ঔদ্ধত্যে মনে-মনে বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু তিনি প্রতাপের প্রতিভাকে মর্যাদা দিয়েছেন, স্নেহমমতা থেকে প্রতাপকে বঞ্চিত করেননি।

বসন্ত রায়ের তত্ত্বাবধানে প্রতাপের নতুন রাজধানী গড়ে উঠেছে।

বিক্রমাদিত্য—সম্ভবত ১৫৮৩ সালের শেষ দিকে—মারা গেলেন। যশোহরে ঘটা করে তাঁর শ্রাদ্ধ হল। আর তারপর—১৫৮৪ সালের এপ্রিলে, বৈশাখী পূর্ণিমায়—বসন্ত রায়ের উদ্যোগে সম্পন্ন হল প্রতাপের রাজ্যাভিষেক।

রাজা প্রতাপাদিত্য।

ধুমঘাটে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী। ১৫৮৭ সালে বসন্ত রায়ের উদ্যোগে রাজা প্রতাপাদিত্যের পুনরভিষেক হল। নতুন রাজধানীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজত্ব আরম্ভ করলেন। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন, বিপুল আয়োজন—অনেক অস্ত্রশস্ত্র, বহু দুর্গ, বিস্তর সৈন্য।

ক্রমে-ক্রমে ধুমঘাট সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত ধুমঘাটের নাম হয়েছে—যশোহর। পুরনো যশোহরের সঙ্গে নতুন যশোহর একাকার হয়ে গিয়েছে।

বসন্ত রায় যশোহর থেকে নিজের রাজধানী সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি নতুন রাজধানী গড়ে তুলেছেন সরশুনা গ্রামের উত্তরদিকে। নতুন দুর্গ হল সেখানে—রায়গড় দুর্গ। দুর্গের পাশে মস্ত দিঘি হল—রায়দিঘি।

সেকালে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের অত্যাচারে মানুষের দুর্গতির অন্ত ছিল না। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ওই দস্যুদের নির্মমভাবে দমন করেছেন। বহু মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন।

তারপর ১৫৯৫ সালের কথা।

বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধতিথিতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য যথারীতি নিমন্ত্রিত হয়েছেন। সেবার মহারাজ প্রতাপাদিত্য এলেন যোদ্ধার সাজে, সঙ্গে কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষী।

সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ঢুকলেন রায়গড় দুর্গে।

দোতলা থেকে গোবিন্দ রায় দেখলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে। সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে যোদ্ধার সাজে এখানে কেন? আজ হয়তো এ-বাড়ির সকলকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের তরবারিতে প্রাণ দিতে হবে। দোতলার বারান্দা থেকে গোবিন্দ রায় দুবার তীর ছুঁড়লেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করে। দুবারই ব্যর্থ হল গোবিন্দ রায়ের তীর।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাগে আগুন হয়ে উঠলেন, খোলা তরবারি হাতে ছুটে গেলেন, তরবারির এক কোপে দুখণ্ড করে ফেললেন গোবিন্দকে।

হাহাকারে চতুর্দিক ভরে গেল।

বসন্ত রায় তখন শ্রাদ্ধে বসেছেন। হাহাকার শুনে তিনি চমকে উঠলেন। চোখের সামনে নিজের পুত্র নিহত—এই দৃশ্য কি কেউ সহ্য করতে পারে? প্রতিশোধ না নিয়ে থাকা যায়?

বসন্ত রায় চিৎকার করতে লাগলেন—গঙ্গাজল আনো, গঙ্গাজল আনো।

শ্রাদ্ধকালে অবশ্যই গঙ্গাজল লাগে। একজন ভৃত্য তাড়াতাড়ি এক ঘটি গঙ্গাজল নিয়ে এল।

ভৃত্য তাড়াতাড়ি ভুল বুঝেছে। কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য ভুল বোঝেননি। তিনি নির্ভুল বুঝতে পেরেছেন বসন্ত রায় কোন 'গঙ্গাজল'

চেয়েছেন। বসন্ত রায়ের প্রকাণ্ড তরবারির নাম 'গঙ্গাজল'। সেই 'গঙ্গাজল' পেলে বসন্ত রায়ের হাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিস্তার নেই।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য দৌড়ে এসে বসন্ত রায়ের মুণ্ডু কেটে ফেললেন।

এই অপকর্মের জন্য মহারাজ প্রতাপাদিত্য অনুতপ্ত হয়েছেন। বিস্তর চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। অজস্র চোখের জলেও এই অন্যায় ধুয়ে যায়নি। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উদারতা, দয়াদাক্ষিণ্য, বীরত্ব, ধর্মনিষ্ঠা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রভৃতি সকল গুণের কথা বসন্ত রায়ের রক্তে ধুয়ে গেছে। তাঁর জীবনের ইতিহাস বসন্ত রায়ের রক্তে কলঙ্কিত হয়ে রইল।

এই ঘটনার ছ-সাত বছর বাদে—সম্ভবত ১৬০২ সালে—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিমলার বিবাহ হল চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে। চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশা থেকে যশোহরের দূরত্ব কম নয়। জলপথ।

নৌকোয় করে রাজা রামচন্দ্র এসেছেন। সঙ্গে কয়েকজন রক্ষী; রক্ষীদের সর্দারের নাম রামমোহন মল্ল। অনেক বরযাত্রী। অনেক নৌকো। বরযাত্রীদের মধ্যে রামাই চুঙ্গী নামে একজন ভাঁড় আছে—রঙ্গ-তামাশা তার কাজ।

ধুমধাম করে বিবাহ হয়ে গেল। অধিকাংশ বরযাত্রী ফিরে গেল চন্দ্রদ্বীপে। রাজা রামচন্দ্র গেলেন না। সঙ্গে রইল আরও কয়েকজন—রক্ষীরা, রামমোহন মল্ল, রামাই চুঙ্গী।

রামাই চুঙ্গীর রঙ্গ-তামাশা একদিন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। গোঁফদাড়ি কামিয়ে স্ত্রীলোক সেজে সে একদিন ঢুকে পড়ল অন্দরমহলে। আর কেউ তো দূরের কথা, স্বয়ং মহারানীকে পর্যন্ত সে রেহাই দিল না। মহারানী দুঃখ পেলেন। তারপর যখন জানতে পারলেন যে স্ত্রীলোক

সেজে রামাই চুঙ্গী অন্দরমহলে ঢুকে অসভ্যতা করেছে তখন মহারানী রাগে একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। একজন ভঁাড়ের এত সাহস।

মহারানী স্থির থাকতে পারলেন না, রাত্রে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে সব কথা জানালেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ভাবলেন রামচন্দ্রের সায় না থাকলে রামাই ভঁাড়ের কিছুতেই এত সাহস হতে পারে না। তিনি হুকুম দিলেন--রামচন্দ্র ও রামাই ভঁাড়ের গর্দান নিতে হবে।

এ যে সাংঘাতিক হুকুম। মহারানী এতদূর আশঙ্কা করেননি। খবর অন্দরমহলে ছড়িয়ে পড়ল। বিমলা ছুটে গিয়ে রাজা রামচন্দ্রকে জানালেন—সর্বনাশের আর বাকি নেই।

প্রাণের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন রাজা রামচন্দ্র। যুবরাজ উদয়াদিত্য এসে তাঁকে বোঝালেন যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাগ পড়ে যাবে, গর্দান নেওয়ার হুকুম তাঁর রাগের কথা, মুখের কথা, ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু রাজা রামচন্দ্র ভয়ে অস্থির। অগত্যা যুবরাজ উদয়াদিত্য গোপনে ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই রাত্রেই রাজা গোপনে সদলে নৌকোয় উঠলেন। নৌকো বাইরে বড় নদীতে এসে পড়ল। আর ভয় নেই।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য মুখে রাজা রামচন্দ্রের গর্দান নেওয়ার হুকুম দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই হুকুম অক্ষরে-অক্ষরে বজায় রাখার জন্য বিন্দুমাত্র উদ্যোগী হননি। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যদি সত্যি-সত্যি রাজা রামচন্দ্রের গর্দান নিতে চাইতেন তো তাঁর সাধ্য কি যে তিনি রাতারাতি গোপনে সদলে নৌকোয় যশোহর থেকে পালিয়ে যান।

রাজা রামচন্দ্রের নৌকো থেকে কামান দাগা হল। এত রাত্রে হঠাৎ তোপের আওয়াজ কেন? খবর নিয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্য জানতে পারলেন যে রাজা রামচন্দ্র সদলে উধাও।

রাজা রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য মহারাজ প্রতাপাদিত্য তখনই

চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো ফল হল না।

দিনের পর দিন চলে গেল, রাজা রামচন্দ্র বিমলার উপর বিমুখ হয়ে রইলেন, বিমলার কোনো খোঁজখবর নিলেন না। যেন সব দোষ বিমলার।

১৬০৫ সাল। আককর মারা গেলেন। তারপর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি ভারতবর্ষের চতুর্থ মোগল সম্রাট। জাহাঙ্গীরের আমলেই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শোচনীয় পতন ও মৃত্যু। কিন্তু আপাতত সেই শোচনীয় ইতিহাস মূলতুবি রেখে আবার বিমলার কথায় ফিরে পাওয়া দরকার।

বিমলার বিবাহের পর চার-পাঁচ বছর কেটে গেল। বিমলা একদিন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে বললেন—আমি মাধবপাশা যাব।

বিমলার দুঃখে মহারাজ প্রতাপাদিত্য মর্মাহত হয়ে আছেন। তিনি আপত্তি করলেন না।

কিন্তু যদি রাজা রামচন্দ্র বিমুখ হয়ে থাকেন, যদি তিনি বিমলাকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে কি বিমলা আবার ফিরে আসবেন যশোহরে? অমন করে ফিরে আসতে হলে বিমলার মান থাকবে না, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চূড়ান্ত অসম্মান হবে। অতএব রটনা করা হল, বিমলা কাশী যাচ্ছেন। রাজা রামচন্দ্র যদি মুখ ফিরিয়ে থাকেন তো, ব্যবস্থা হয়ে রইল, বিমলা আর যশোহরে ফিরে আসবেন না, কাশী চলে যাবেন।

বিস্তর সাজসরঞ্জাম ও ধনরত্ন নিয়ে বিমলা নৌকোয় উঠলেন। সঙ্গে উপযুক্ত লোকজন। স্বয়ং মহারাজ প্রতাপাদিত্য উদ্যোগী হয়ে সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কি সেদিন ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পেরেছেন যে চার-পাঁচ বছর বাদে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হবেন, ঢাকায় মোগলদের কারাগারে শিকলবাঁধা বন্দী হয়ে থাকবেন অনেক দিন, লোহার খাঁচায় বদ্ধ থেকে নৌকোয়

উঠতে হবে, তাঁকে নিয়ে নৌকো রওনা হবে আগ্রার দিকে, কিন্তু আগ্রায় তাঁকে যেতে হবে না, পথে বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হবে ?

যশোর থেকে মাধবপাশার দূরত্ব কম নয়। জলপথ। মাধবপাশার অদূরে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, নদীর কূলে বিমলার নৌকো বাঁধা হল। খবর ছড়াতে দেরি হল না। বউঠাকুরানী এসেছেন। বউঠাকুরানী এসেছেন।

প্রজারা দলে-দলে আসতে লাগল বউঠাকুরানীর কাছে। যত দীনদুঃখী বউঠাকুরানীর পায়ের ধুলো নিতে এসেছে, কেউ খালি হাতে ফিরে যায়নি, বউঠাকুরানী সকলকে দু-হাত ভরে দিয়েছেন। বউঠাকুরানীর দরাজ হাতের কথা গোপন রইল না, মানুষের ভিড় ক্রমশ বাড়তে লাগল।

এত মানুষের ভিড় যে সেখানে সপ্তাহে দুদিন করে হাট বসতে লাগল। লোকের মুখে-মুখে হাটের নাম হল—বউঠাকুরানীর হাট।

দিনের পর দিন নৌকোয় থাকা যায় না।

খানিক দূরে সারসী গ্রাম। সেই গ্রামের কাছে নৌকো রেখে বিমলা ডাঙায় তাঁবু খাটিয়ে নিলেন। তাঁবুতে বিমলার দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু রাজা রামচন্দ্রের দেখা নেই। হয়তো তিনি চিরকালের জন্য বিমলার উপর বিমুখ হয়ে আছেন। হয়তো বিমলাকে কাশী চলে যেতে হবে।

সব খবর শুনে রাজা রামচন্দ্রের মা স্থির থাকতে পারলেন না। বিমলাকে নিয়ে আসার জন্য পুত্রকে হুকুম দিলেন। কিন্তু মায়ের হুকুমেও কাজ হল না, রাজা রামচন্দ্র চুপচাপ রইলেন।

মা চুপ করে থাকলেন না। তিনি নিজেই চলে এলেন বিমলার কাছে।

শাশুড়িকে দেখে বিমলা ঘোমটায় মুখ ঢাকলেন। তাঁর পায়ের কাছে মোহর ভর্তি একখানা সোনার থালা প্রণামী রেখে প্রণাম

করলেন। আর শাশুড়ি দামী গহনায় ভর্তি হাতির দাঁতের একটি বাক্স বিমলার হাতে দিলেন, বিমলাকে আশীর্বাদ করলেন, বিমলাকে কোলে তুলে নিলেন। দুজনের চোখ জলে ভরে গেল।

বিমলাকে নিয়ে মহাসমারোহে তাঁর শাশুড়ি মাধবপাশায় ফিরে এলেন।

কয়েকদিন পরে বিমলার আশা পূর্ণ হল। রাজা রামচন্দ্র আর বিমুখ রইলেন না। দিনের পর দিন নির্বিঘ্নে কেটেছে। রাজা রামচন্দ্র আর বিমলার দুই পুত্র জন্মেছে—কীর্তিনারায়ণ আর বসুদেবনারায়ণ।

রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কীর্তিনারায়ণ রাজা হয়েছেন। কীর্তি-নারায়ণের পর বসুদেবনারায়ণ রাজত্ব করেছেন।

দিনের পর দিন চলে গেছে। কত উদয়, কত অস্ত।

কোথায় কীর্তিনারায়ণ, কোথায় বসুদেবনারায়ণ।

কীর্তিনারায়ণ কিংবা বসুদেবনারায়ণ তো দূরের কথা, বিমলার নাম পর্যন্ত মানুষের মন থেকে আস্তে-আস্তে মুছে গেছে। কিন্তু বহু যুগ পরেও মানুষ মনে রেখেছে একটি হাটের নাম—বউঠাকুরানীর হাট।

মহামূল্যবান রত্ন

বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বির বিষ্ণুপুরকে দুর্ভেদ্য ও অজেয় করে গড়ে তুলেছেন। চতুর্দিকে পরিখা কাটিয়েছেন; পরিখার পাড়ে সারি-সারি কামান সাজিয়েছেন। শোনা যায়, বীর হাম্বিরের নির্দেশে জগন্নাথ কর্মকার ও আরও কয়েকজন কারিগর বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কামান 'দলমর্দন' এবং আরও কয়েকটি কামান বানিয়েছেন।

অন্যের উপর কাজের ভার দিয়ে রাজা হাম্বির কখনও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেননি। সবদিকে নিজে সতর্ক নজর রেখেছেন। যেন বিষ্ণুপুর নিরাপদ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

১৫৬৫ সাল থেকে ১৫৭২ সাল পর্যন্ত সুলেমান কররানী বঙ্গদেশে রাজত্ব করেছেন। তাঁর রাজত্বকালে বঙ্গদেশ উত্তর-পূব ভারতবর্ষের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। সুলেমান কররানীর রাজ্যের সীমা উত্তরে কোচ-সীমান্ত থেকে দক্ষিণে পুরী এবং পশ্চিমে শোণ নদী থেকে পুবে ব্রহ্মপুত্র নদ।

সুলেমান কররানীর হুকুমে তাঁর পুত্র দাউদ খাঁ হঠাৎ বিস্তর সৈন্য নিয়ে ছাউনি ফেললেন বিষ্ণুপুরের কাছে রানীসাগর গ্রামে, হঠাৎ আক্রমণ করলেন বিষ্ণুপুর।

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য রাজা হাম্বির প্রস্তুত ছিলেন না।

গোড়ার দিকে রাজা হাম্বিরের সৈন্যসামন্ত হেরেছে, রাজা হাম্বির বিব্রত হয়ে পড়েছেন।

বিষ্ণুপুরের উত্তর সীমান্তের শেষ পরিখার ওপারে দেউলি ও চাকদহ গ্রামের মধ্যিখানে একটি প্রান্তরের নাম মুণ্ডমালাঘাট। সেখানে পাহাড়ের উপরে ছিল ভয়ঙ্করী কালীপ্রতিমা; তার গলায় থাকত সত্যি-সত্যি নরমুণ্ডের মাথা। অতএব, লোকে বলে, এই জায়গার নাম মুণ্ডমালাঘাট। বিষ্ণুপুরের বহু রাজা এই মুণ্ডমালাঘাটে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন।

মুণ্ডমালাঘাটের পশ্চিমদিকে যুদ্ধের ঘাঁটি। এই 'যুদ্ধের ঘাঁটি' মুখে-মুখে হয়ে গিয়েছে—যুঝঘাটি।

রাজা হাম্বির সাহসী ও রণকুশল। গোড়ার দিকে জয়ী হলেও দাউদ খাঁ শেষপর্যন্ত পরাস্ত হয়েছেন রাজা হাম্বিরের কাছে। রাজা হাম্বির ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন দাউদের সেনাবাহিনী; পাঠান সৈন্যদের শবে ভর্তি হয়েছে মুণ্ডমালাঘাট আর যুঝঘাটি।

দাউদ বন্দী হয়েছেন। এবার শত্রুর হাতে মৃত্যু তো অনিবার্য।

কিন্তু মৃত্যু হল না, অঘটন ঘটে গেল। রাজা হাম্বির সসম্মানে মুক্তি দিলেন দাউদকে! তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন নিরাপদ এলাকায়। বিজয়ী রাজার এই বীরত্বে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে দাউদ বললেন—রাজা হাম্বির সত্যি-সত্যি বীর।

তখন থেকেই, লোকে বলে, মানুষের যুগে-যুগে রাজা চিরকালের জন্য হয়ে গেলেন—বীর হাম্বির।

যুঝঘাটির আরেকটা নতুন নাম হয়েছে। দাউদের সঙ্গে যুদ্ধের পর থেকে কেউ-কেউ 'যুঝঘাটিকে বলে—দাউদঘাটা।

দাউদ বাঙলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান। তিনি মারা গেছেন ১৫৭৬ সালের ১১ জুলাই।

বছরের পর বছর কেটে গেল।

অম্বররাজ ভগবানদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র মানসিংহ। ইনি সুদক্ষ সেনাপতি, প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ। মুঘলসম্রাট আকবর তাঁকে হাজারী মনসবদার করেছেন।

পাঠানেরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। পাঠানদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন উত্তর উড়িষ্যার অধিপতি কতলু খাঁ। তাঁকে দমন করতে না পারলে মুঘল-সাম্রাজ্যের সমূহ ক্ষতি।

অতএব মানসিংহ এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন তাঁর পুত্র জগৎসিংহ। এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত।

মানসিংহ শিবির করলেন জাহানাবাদে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে জগৎসিংহ আরও এগিয়ে গিয়েছেন।

কতলু খাঁয়ের সেনাপতি বাহাদুর কুরু মুঘলদের বিরুদ্ধে সর্বনাশা চক্রান্ত করেছেন। কিন্তু জগৎসিংহ সে-সব খবর পাননি। খবর রেখেছেন বীর হাম্বির।

বীর হাম্বির একদিন গোপনে জগৎসিংহকে জানালেন—বাহাদুর কুরু আপনাদের বিরুদ্ধে সর্বনাশা চক্রান্ত করেছেন। আপনি যদি সতর্ক না হন তাহলে সমূহ বিপদ।

কথা কানে নিলেন না জগৎসিংহ।

কতলু খাঁ, ১৫৯১ সালের ২১শে মে, সহসা জগৎসিংহের শিবির আক্রমণ করলেন। এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না মুঘলবাহিনী। ফলে যা হওয়ার তাই হল, মুঘলবাহিনী পরাস্ত হল, কতলু খাঁ জয়ী হলেন।

যুদ্ধে জগৎসিংহ আহত হয়েছেন বটে, কিন্তু কতলু খাঁ তাঁকে বন্দী করতে পারেননি। গোড়া থেকে বীর হাম্বির নজর রেখেছেন; তিনি জগৎসিংহকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে গেলেন।

কিছুকাল বাদে মারা গেলেন কতলু খাঁ; পাঠান সেনাপতিদের

মধ্যে বিবাদ বেধে গেল। উজীর খাজা ইশা মসনদে বসালেন কতলু খাঁর বালকপুত্র নাসিরকে।

মুঘলের অধীনতা স্বীকার করে নিলেন পাঠানেরা।

বীর হাম্বির, আগেই বলা হয়েছে, উদ্ধার করেছেন জগৎসিংহকে। এবং খুব স্বাভাবিক, তার ফলে মানসিংহের সুনজরে পড়েছেন। মুঘলেরা বীর হাম্বিরকে অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

বীর হাম্বিব উদ্ধার করেছেন জগৎসিংহকে—কথাটা পাঠানেরা ভোলেননি। বীর হাম্বিরের উপর তাঁদের আক্রোশ আছে। সময়মতো একদা তাঁরা বীরবিক্রমে আক্রমণ করলেন বীর হাম্বিরের রাজ্য। কিন্তু তাঁবা চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হলেন। আর কোনোদিন তাঁরা বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেননি।

লোকে বলে, মানসিংহ বিষ্ণুপুরে এসেছেন; বিষ্ণুপুর দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন; দিল্লীতে গিয়ে বাদশাহ আকবরের কাছে বিষ্ণুপুরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

মানসিংহের অনুগ্রহে বীর হাম্বিরের রাজ্যের সীমা চতুর্দিকে অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে।

বীর হাম্বিরের জীবনে অতঃপর আর যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী নেই। অন্যবকম কাহিনী আছে।

আবার বলা ভালো, বীর হাম্বিরের একান্ত ইচ্ছা—বিষ্ণুপুরকে নিরাপদ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলেন। কিন্তু তা করতে হলে অনেক টাকা দরকার। অত টাকা কোথায়?

রাজজ্যোতিষী দেবনাথ বাচস্পতির উপর বীর হাম্বিরের অগাধ আস্থা। তিনি একদিন বললেন—মহারাজ, বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দিনকয়েকের মধ্যে কয়েকটি গোরুর গাড়িতে মহামূল্যবান রত্ন পার হয়ে যাবে।

মহামূল্যবান রত্ন! শুনে চমকে উঠলেন বীর হাম্বির, সাব্যস্ত

করলেন সেসব রত্ন লুঠ করতে হবে, অনেক টাকা দরকার, বিষ্ণুপুরকে নিরাপদ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে।

বীর হাম্বির হুকুম দিলেন সেনাপতিকে—বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দিনকয়েকের মধ্যে কয়েকটি গোরুর গাড়িতে মহামূল্যবান রত্ন পার হয়ে যাবে। গোপনে সেসব লুঠ করে আনতে হবে। কিন্তু, খুব সাবধান, খুনজখম বা জোরজবরদস্তি না করে কৌশলে কাজ উদ্ধার করা চাই।

হুকুম মতো গোপনে সৈন্য মোতায়েন হল বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে।

সত্যি-সত্যি একদিন দুপুরবেলা বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকখানা গোরুর গাড়ি দেখা গেল। এবং গোরুর গাড়ির মধ্যে অনেক কাঠের বাক্স। কী আছে ওসব বাক্সের মধ্যে? মহামূল্যবান রত্ন?

গোরুর গাড়িগুলি বৃন্দাবন থেকে এসেছে। বিষ্ণুপুর পার হয়ে যাওয়ার কথা।

গোরুর গাড়িগুলির পাহারাদার হিসেবে আছেন কয়েকজন লেঠেল ও বৈষ্ণব। অধিপতি হিসেবে ওঁদের সঙ্গে আছেন তিনজন আচার্য—শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ।

অলক্ষ্যে গোরুর গাড়িগুলির দিকে নজর রেখেছে বীর হাম্বিরের সৈন্যেরা।

সন্ধ্যা হয়ে এল। গোরুর গাড়িগুলি থামল গোপালপুর গ্রামে। আড়াল থেকে সৈন্যেরা দেখছে—সংকীর্তন, শাস্ত্রচর্চা আর খাওয়া-দাওয়ার পর বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন সকলে। মধ্যরাত্রে সুযোগ বুঝে সৈন্যেরা নিঃশব্দে বাক্সের পর বাক্স নিয়ে উধাও হয়ে গেল। একটিও বাক্স পড়ে রইল না গোরুর গাড়িতে।

সব বাক্স হাজির হল বীর হাম্বিরের কাছে। হ্যাঁ, নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা হয়েছে। খুনজখম বা রাহাজানি তো দূরের কথা, টু শব্দটিরও

প্রশ্ন ওঠেনি।

বীর হাম্বিরের হুকুমে সব বাক্স খুলে ফেলা হল। কিন্তু কোথায় মহামূল্যবান রত্ন ?

সব বাক্সের মধ্যে শুধু রাশি-রাশি বৈষ্ণবপুঁথি।

হতাশ হলেন বীর হাম্বির। রাজজ্যোতিগী দেবনাথ বাচস্পতির উপর মনে-মনে রাগ করলেন—কী আজেবাজে কথা বলেছেন তিনি, এই কি মহামূল্যবান রত্নের নমুনা ?

বীর হাম্বিরের হুকুমে সমস্ত পুঁথি রাখা হল রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে।

ওদিকে শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙার পর শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ এবং আরও সকলে জানতে পারলেন যে সর্বনাশ হয়েছে, সমস্ত পুঁথি চুরি হয়ে গিয়েছে। শ্যামানন্দ ও নরোত্তম মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বুক চাপড়ে পাগলের মতো হাহাকার করতে লাগলেন শ্রীনিবাস আচার্য।

পুঁথিগুলির মধ্যে অন্তত একখানা পুঁথির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। অতি বৃদ্ধ বয়সে সাত বছর পরিশ্রম করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' লিখেছেন। ১০৫০৩টি পয়ার এবং ১০১২টি শ্লোকে তিনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেছেন, ১০১২টি শ্লোকের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজে রচনা করেছেন ৯৭টি শ্লোক, বাকি শ্লোকগুলি তিনি নিয়েছেন, পুরাণ, স্মৃতি, কাব্য এবং বিশেষ করে রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপুর, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতির রচনাবলী থেকে।

নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দকে বিষ্ণুপুর থেকে চলে যেতে বললেন শ্রীনিবাস আচার্য। দুজনেরই অগাধ ভক্তি শ্রীনিবাসের উপর, কেউই অগ্রাহ্য করতে পারলেন না তাঁর কথা, দুজনেই চলে গেলেন সন্তোষ-গ্রামে।

শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে খবর পাঠালেন যে সমস্ত পুঁথি বিষ্ণুপুরে চুরি হয়ে গিয়েছে। কী দারুণ দুঃসংবাদ!

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তখন বৃন্দাবনে। এই দুঃসংবাদ শুনে, লোকে বলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছেন।

পুঁথিগুলি উদ্ধারের জন্য শ্রীনিবাস আচার্য একা চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দিনের পর দিন চলে গেল, কিন্তু কোথাও কোনও আশা-ভরসা পাওয়া গেল না। পুঁথিগুলি কি কিছুতেই উদ্ধার করা যাবে না?

ঘুরতে-ঘুরতে দশদিন বাদে শ্রীনিবাস আচার্য এলেন বিষ্ণুপুরের উত্তরে দেউলি গ্রামে। সেখানে আলাপ হল কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তীর সঙ্গে। শ্রীনিবাস আচার্যের মুখে পুঁথিচুরির কাহিনী শুনে কৃষ্ণবল্লভের মন দুঃখে ভরে গেল।

কৃষ্ণবল্লভ বললেন--আপনি দয়া করে আমার এখানে দু-একদিন থাকুন, বিশ্রাম করুন। তারপর একদিন আমার সঙ্গে চলুন রাজ-দরবারে। ওসব পুঁথির খোঁজ করার জন্য রাজা বীর হাম্বিরের কাছে আবেদন করি।

শ্রীনিবাস আচার্য রাজী হলেন।

দুজনে একদিন হাজির হলেন রাজদরবারে। সেখানে তখন রাজপণ্ডিত শ্রীব্যাস চক্রবর্তী শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। মুগ্ধ হয়ে শুনছেন স্বয়ং রাজা বীর হাম্বির এবং আরও অনেকে। এই অবস্থায় কি আর কোনও আবেদন করা চলে? অগত্যা দুজনে চুপচাপ বসে রাজপণ্ডিতের শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনতে লাগলেন।

পরদিন। শ্রীনিবাস আচার্য আর কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী সেদিনও এসেছেন রাজদরবারে। সেদিনও শ্রীব্যাস চক্রবর্তী দরবারে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন, মুগ্ধ হয়ে শুনছেন স্বয়ং রাজা বীর হাম্বির এবং আরও

অনেকে।

সেদিন আর শ্রীনিবাস আচার্য শেষপর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারলেন না। সভার মধ্যে বলে উঠলেন—পাঠ ও ব্যাখ্যা ভুল হচ্ছে।

শ্রীব্যাস চক্রবর্তী রাগ করে বললেন—আপনি কোথাকার কে? খুব বড় পণ্ডিত বুঝি আপনি? আমার পাঠ ও ব্যাখ্যা ভুল হচ্ছে?

শ্রীনিবাস আচার্য নম্র গলায় বললেন—আমি কেউ নই, কিছু নই। কিন্তু আপনার পাঠ ও ব্যাখ্যা ভুল হচ্ছে।

শ্রীব্যাস চক্রবর্তী আরও রাগ করে বললেন—তাহলে আপনি নিজে নির্ভুল পাঠ ও ব্যাখ্যা করে সকলকে শোনান।

রাজা বীর হাম্বির কী দেখলেন শ্রীনিবাস আচার্যের মুখে, কী শুনলেন তাঁর গলায় কে জানে। তিনি বিনীতভাবে বললেন—দয়া করে আপনি নিজে নির্ভুল পাঠ ও ব্যাখ্যা করে আমাদের শোনান।

শ্রীনিবাস আচার্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনালেন। সকলে মুগ্ধ হলেন। এমন জীবন্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা কেউ কখনও শোনেননি। স্বয়ং রাজা বীর হাম্বির সিংহাসন থেকে নেমে এসে শ্রীনিবাস আচার্যের পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন—আজ থেকে আপনি আমার গুরু। আমি আপনাকে বিষ্ণুপুর ছেড়ে কোথাও যেতে দেব না। আপনাকে দয়া করে সারাজীবন বিষ্ণুপুরেই থাকতে হবে।

কথা দিলেন না শ্রীনিবাস আচার্য। কাতরভাবে জানালেন রাশি-রাশি অমূল্য পুঁথির কথা, সব পুঁথি চুরি হয়ে গিয়েছে। বীর হাম্বির বুঝতে পারলেন যে ওসব পুঁথি তুচ্ছ জিনিস নয়, রাজজ্যোতিষী দেবনাথ বাচস্পতি অক্ষরে-অক্ষরে সত্যকথা বলেছেন, ওসব পুঁথি মহামূল্যবান রত্ন।

শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে অতঃপর বীর হাম্বির কোনও কথাই গোপন করলেন না। তাঁকে নিয়ে বীর হাম্বির হাজির হলেন রাশি-রাশি পুঁথির সামনে - রাশি-রাশি মহামূল্যবান রত্ন।

মহামূল্যবান রত্ন উদ্ধার করা গেল, আনন্দে আত্মহারা হয়ে শ্রীনিবাস আচার্য চিৎকার করে উঠলেন—হরি-হরি।

বীর হাম্বিরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন—কৃষ্ণপদে মতি হোক।

শ্রীনিবাস আচার্য আশ্বাস দিলেন বীর হাম্বিরকে—কথা দিলাম, আমি বিষ্ণুপুর ছেড়ে কোথাও যাব না।

রাজপণ্ডিত শ্রীনিবাস চক্রবর্তী প্রথম সপরিবারে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য হয়েছেন, বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নেওয়ার পর শ্রীব্যাস চক্রবর্তীর নতুন নাম হয়েছে -ব্যাসাচার্য।

স্বয়ং বীর হাম্বিরও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে। দীক্ষা নেওয়ার পর নতুন নাম হয়েছে তাঁর। কী নাম? এ-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন—হরিচরণ দাস; কেউ বলেন -শ্রীচৈতন্য দাস; কেউ বলেন -শ্রীগোবিন্দ দাস।

বীর হাম্বির যখন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন তখন থেকেই বিষ্ণুপুরে বাঙালীরীতির অজস্র মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়েছে।

বীর হাম্বির বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর বিষ্ণুপুরের বহু মানুষ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন: ঘরে-ঘরে সংকীর্তন, ঘরে-ঘরে হরিনাম।

বীর হাম্বিরের জীবন অন্যরকম হয়ে গেল। যুদ্ধবিগ্রহের কথা তিনি পুরোপুরি ভুলে গেলেন। হয়ে উঠলেন সত্যি-সত্যি বৈষ্ণব। বীর হাম্বির নিজেই লিখেছেন:

"প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলা মনে আশ
তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিল মীঠ
ঘুচাইলা রাজ অহঙ্কার।"

বিষ্ণুপুরে খড়বাংলা মহল্লায় শ্রীনিবাস আচার্যের জন্য নতুন বাড়ি হয়েছে। সেখানে শ্রীনিবাস আচার্য রাধারমণের মন্দির করেছেন।

বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিমে গোপালপুর গ্রাম। বীর হাম্বিরের অনুরোধে শ্রীনিবাস আচার্য দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন গোপালপুরের রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতীকে। শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরদের মধ্যে অন্তত দুজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীর নাম সকলেই জানে—রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী আর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী।

এই পৃথিবীতে বৈষ্ণবদের বাসভূমির মধ্যে বৃন্দাবন সর্বশ্রেষ্ঠ। বৃন্দারণ্যে দ্বাদশটি প্রধান বন আছে—ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহা, তাল, খদীরক, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু, ও বৃন্দাবন।

যমুনার পূবদিকে পাঁচটি বন আর যমুনার পশ্চিমদিকে সাতটি বন। এই যমুনার জল স্পর্শ করলে, কেউ-কেউ বলে, গঙ্গাজল স্পর্শের চেয়ে কোটিগুণ পুণ্য হয়। ভক্তের চোখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সতত বিরাজিত থাকেন; বৃন্দাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি - পুণ্যময় মহাতীর্থ।

বীর হাম্বির গেলেন বৃন্দাবন। সেখানে গোপীনাথ জীউ, গোবিন্দ জীউ ও মদনমোহন জীউ—এই তিন বিগ্রহের নামে তিনি বিস্তর ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করলেন।

আবার ফিরে এলেন বিষ্ণুপুরে। কিন্তু সারাক্ষণ বীর হাম্বিরের মনের মধ্যে পুণ্যময় মহাতীর্থ বৃন্দাবন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সম্ভবত ১৬০০ সালে বীর হাম্বির বিষ্ণুপুরে একটি রাসমঞ্চ নির্মাণ করেছেন। ঝামাপাথরের বিশাল বেদীর উপর ইটের এই আশ্চর্য রাসমঞ্চ স্থাপিত। পাঁচফুট উঁচু, লম্বাচওড়ায় প্রায় আশিফুট। গর্ভগৃহ ও তার দক্ষিণে একটি উপকথাকে ঘিরে তিনপ্রস্থ দেয়াল—সকল দেয়ালে বড়-বড় আটকোনা থামের উপর ফুলকাটা চওড়া খিলান। উৎসবের সময়ে চমৎকার সাজানো হত রাসমঞ্চ, বিষ্ণুপুরের সমস্ত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ নিয়ে আসা হত সেখানে, হাজার-হাজার মানুষ আসতেন উৎসবে।

বিষ্ণুপুরের পাশে মথুরা, দ্বারকা, মধুবন প্রভৃতি নতুন নামে গ্রাম গড়ে উঠেছে। বিষ্ণুপুরের ভিতরে ও আশেপাশে কৃষ্ণবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ প্রভৃতি নামে মস্ত-মস্ত জলাশয় খনন করা হয়েছে। আরও কত কি। এত সব কাজ, বলা বাহুল্য, একদিনে হয়নি, সময় লেগেছে—একা বীর হাম্বিরের পক্ষে হয়তো সব কাজ করে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যাই হোক, একদা বিষ্ণুপুর, কারও-কারও মতে, হয়ে উঠেছে আরেক বৃন্দাবন। বিষ্ণুপুরকে—একদা কেউ-কেউ বলেছেন—গুপ্ত বৃন্দাবন।

আবার বীর হাম্বিরের কথায় ফিরে যাই।

দিনরাত বীর হাম্বির কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর। রাজকার্যে ঘোরতর অনিচ্ছা। বছরের পর বছর সরকারি খাজনা বাকি পড়ে গেল।

বাকি খাজনার দায়ে বীর হাম্বির বন্দী হলেন নবাবের কারাগারে। বিষ্ণুপুর থেকে অনেক দূরে নবাবের কারাগার।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বীর হাম্বির কিছুকাল ঘুরলেন তীর্থে-তীর্থে; তারপর রওনা হলেন বিষ্ণুপুরের দিকে।

পথে বৃষভানুপুরের জঙ্গল।

মস্ত জঙ্গল। রাত্রে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়া দুরূহ। জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে যদি কোথাও একটু আশ্রয় মেলে—এই চিন্তায় আকুল হলেন বীর হাম্বির।

একটা মন্দির চোখে পড়ল। মন্দিরের মধ্যে মদনমোহনের বিগ্রহ, পাশেই আছে রাধার বিগ্রহ। মদনমোহনের বিগ্রহ দেখে বীর হাম্বির মুগ্ধ হলেন। প্রণাম করলেন মদনমোহনকে। কী অপরূপ মূর্তি মদনমোহনের! ত্রিভঙ্গ, স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণে অঞ্জনের আভা, নীলমনির দ্যুতি, কানে রত্নদুল, কপালে চন্দনের তিলক, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় বনমালা, পরনে পীতাম্বর, হাতে বাঁশি। এবং মূর্তির সর্বাঙ্গে পদ্মগন্ধ। অপলক চোখে বীর হাম্বির তাকিয়ে রইলেন মদনমোহনের দিকে।

যেন ইহজীবনে এমন সুন্দর মূর্তি তিনি আর দেখেননি।

বীর হাম্বির মনে-মনে মদনমোহনকে বললেন—তোমাকে ছেড়ে আর আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

পূজারী ব্রাহ্মণের নাম ধরণী। তিনি মন্দিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে?

বীর হাম্বির বললেন—আমি বীর হাম্বির। দয়া করে আজ রাত্তিরের জন্য আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন?

ধরণী কৃতার্থ হয়ে বললেন—স্বয়ং রাজা আজ আমার অতিথি হয়েছেন। আজ আমার আনন্দের অন্ত নেই।

ধরণী চরণামৃত নিয়ে এলেন। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে চরণামৃত পান করলেন বীর হাম্বির। বললেন—দয়া করে আপনি এই মদনমোহন আমাকে দান করুন।

ধরণী আপত্তি করে বললেন—সংসারে এই মদনমোহনই আমার সর্বস্ব। ওঁকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

বীর হাম্বির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আমারও সেই দশা। তাহলে দয়া করে মদনমোহনকে নিয়ে আপনিও আমার সঙ্গে বিষ্ণুপুরে চলুন আমি মদনমোহনেরও সেবা করব, আপনারও সেবা করব। আপনি রাজী হলে আমরা দুজনেই মদনমোহনের কাছে থাকতে পারব।

মদনমোহনকে নিয়ে বৃষভানুপুর ছেড়ে বিষ্ণুপুরে যেতে ধরণী কিছুতেই রাজী হলেন না।

বীর হাম্বির বললেন—তাহলে, আপনি অনুমতি করুন, আমি এখানেই থেকে যাই। মদনমোহনের সেবা করে বাকি জীবন এখানেই কাটিয়ে দিই।

ধরণী অবাক হয়ে বললেন—কী বলছেন মহারাজ? কত ঐশ্বর্য আপনার, কত বড় রাজ্য আপনার—সব ছেড়ে আপনি এখানে জীবন কাটিয়ে দেবেন?

বীর হাম্বির বললেন—হ্যাঁ। এই মদনমোহনকে ছেড়ে আর আমি
ছুতেই থাকতে পারব না।

ধরণী বললেন—মহারাজ, আপনার নিষ্ঠা ও ভক্তি অতুলনীয়।

বলে ধরণী চলে গেলেন। বীর হাম্বিরকে তো আর উপোসী রাখা
য় না ; তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বীর হাম্বির পড়ে রইলেন মন্দিরে।

খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে ধরণী মন্দিরে এলেন। কিন্তু বীর
ম্বির কিছুই খেতে রাজী হলেন না। বললেন -প্রভুর চরণামৃত পান
রছি, আজ আমার আর কিছু দরকার নেই।

যেমন ছিলেন তেমনি পড়ে রইলেন মন্দিরে। মনে-মনে প্রার্থনা
তে লাগলেন মদনমোহনের কাছে। শেষ রাত্রে আধোঘুমের মধ্যে
। হাম্বির যেন শুনলেন মদনমোহনের আদেশ—তুমি আমাকে চুরি
র বিষ্ণুপুরে নিয়ে চলো।

আদেশ শোনার পর বীর হাম্বির আর দেরি করলেন না। সঙ্গে-
ঙ্গ মদনমোহনকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন বিষ্ণুপুরের দিকে। আগে
করেছেন মহামূল্যবান রত্ন। এবার চুরি করলেন মদনমোহন—এবার
কবারে সরাসরি নিজের হাতে।

বিষ্ণুপুরে এসে বীর হাম্বির রাজবাড়ির লক্ষ্মীঘরে লুকিয়ে রাখলেন
মমোহনকে।

সকালবেলা ধরণী মন্দিরে এসে দেখলেন মদনমোহন নেই। মাথায়
কাশ ভেঙে পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখলেন। মদনমোহন
থায় ?—বলতে-বলতে পলকে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ
। জ্ঞান ফিরে এল। কোথায় মদনমোহন ?—বলতে-বলতে আবার
ান হয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পর একটু সুস্থ হলেন। উঠে দাঁড়ালেন। দু-চোখ থেকে
য় জল পড়তে লাগল। মদনমোহন কোথায় ?—বলতে-বলতে ধরণী

পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন বিষ্ণুপুরের দিকে। পথে যাকে দেখেন তাকেই জিজ্ঞেস করেন--এ-পথে কেউ মদনমোহনকে দেখেছ?

ছুটতে-ছুটতে ধরণী বিষ্ণুপুরের রাজবাড়িতে এসে সরাসরি বীর হাম্বিরকে জিজ্ঞেস করলেন--আমার মদনমোহন কোথায়?

বীর হাম্বির বললেন—আপনার মদনমোহন আমার এখানে আসেননি। কিন্তু আপনার মদনমোহনের মতো আমার অন্য মদনমোহন আছেন। দেখবেন?

—দেখব।

—বহু দূর থেকে আপনি এসেছেন, আপনি ক্লান্ত। এখন আপনি বিশ্রাম করুন। পরে আমি আপনাকে আমার মদনমোহন দেখাব।

ধরণীর বিশ্রামের ব্যবস্থা হল।

বীর হাম্বিরের হুকুমে নিপুণ কারিগর গোপনে তাড়াতাড়ি গড়ে ছিল বৃষভানুপুরের মদনমোহনের মতো তিন মূর্তি; তিন মূর্তির তিন নাম--যুগলকিশোর জীউ, গৌরগোবিন্দ জীউ, রাধাকান্ত জীউ।

বীর হাম্বির তারপর ধরণীকে দেখালেন তিন মূর্তি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধরণী বললেন --নাঃ, কেউ আমার মদনমোহন নয়।

বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। কাঁদতে-কাঁদতে তিনি বিষ্ণুপুরের পথে-পথে হাহাকার করতে লাগলেন—আমার মদনমোহন কোথায়?

কোথাও মদনমোহনের দেখা পাওয়া গেল না। অতএব ধরণী সাব্যস্ত করলেন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন। অন্ধকারে।

ক্লান্ত হয়ে ধরণী সন্ধ্যাবেলা নদীর পাড়ে বসে পড়লেন।

রাজপুরোহিতের মা কলসি করে জল নিতে এসেছেন নদীর পাড়ে অচেনা মানুষ দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে? আপনার নাম কি? বাড়ি কোথায়? এখানে এসেছেন কেন?

ধরণী বিরক্ত হয়ে বললেন—মা, অত কথায় কাজ কি? জল নিতে এসেছ, জল নিয়ে ঘরে যাও।

কিন্তু অত সহজে ছাড়লেন না রাজপুরোহিতের মা। কথায়-কথায় জেনে নিলেন আসল বৃত্তান্ত। মদনমোহনের দেখা না পেলে ধরণী নির্ঘাত অন্ধকার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন!

রাজপুরোহিতের মা বললেন—আমি যদি আপনাকে মদনমোহনের খোঁজ দিতে পারি···

ধরণী ব্যাকুল হয়ে বললেন—দিতে পারো দাও? দেরি কোরো না, এখনই দাও। মা, তুমি কে?

রাজপুরোহিতের মা বললেন—আমি রাজপুরোহিতের মা। খবর আমি আমার ছেলের মুখে শুনেছি। কাউকে বলা বারণ। আপনার দুরবস্থা দেখে আপনাকে না বলে পারছি না। শুনুন, আমাদের রাজা বীর হাম্বির একজন নতুন ঠাকুর এনেছেন, নতুন ঠাকুরের নাম মদনমোহন; রাজা সেই ঠাকুরকে লুকিয়ে রেখেছেন লক্ষ্মীঘরে।

সঙ্গে-সঙ্গে ধরণী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—মা, তোমার কাছে মদনমোহনের ঠিকানা পেয়ে বাঁচলাম, আমি আর মরব না।

ধরণী চলে গেলেন। অন্ধকার নদী পিছনে পড়ে রইল।

পরদিন সকালে ধরণী হাজির হলেন বীর হাম্বিরের কাছে। বললেন—পাকা খবর পেয়েছি, আমার মদনমোহন আপনার কাছে আছে। আপনি তাকে আপনার লক্ষ্মীঘরে লুকিয়ে রেখেছেন।

গোপন কথা জেনে ফেলেছেন ধরণী। তবু বীর হাম্বির বললেন—না, আপনার মদনমোহনকে আমি আমার লক্ষ্মীঘরে লুকিয়ে রাখিনি।

ধরণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আমার মদনমোহনকে না পেলে আমি অনশনে আত্মহত্যা করব।

চমকে উঠলেন বীর হাম্বির। তাঁর রাজ্যে অনশনে আত্মহত্যা করবেন ধরণী? এমন শোচনীয় ঘটনা কি কিছুতেই এড়ানো যাবে না?

কোনও কথা না বলে বীর হাম্বির চলে গেলেন লক্ষ্মীঘরে।

মদনমোহনকে বললেন—তুমি অন্তর্যামী, আমার মনের সব কথাই তো তুমি জানো। ধরণী আমার চোখের সামনে অনশনে আত্মহত্যা করবেন—এ-দৃশ্য আমি সইতে পারব না। আবার তোমাকে ছেড়ে দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। বলো, আমি এখন কী করি?

অন্নজল ছেড়ে মদনমোহনের সামনে শুয়ে রইলেন বীর হাম্বির। অনবরত প্রার্থনা করতে লাগলেন মদনমোহনের কাছে।

মদনমোহন শেষরাত্রে বীর হাম্বিরকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—ধরণী আমাকে পুত্রস্নেহে পালন করেছে। তাঁকে দেখা না দিয়ে পারব না। কাল সকালে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো। যেমন করে পারো তাঁকে তুষ্ট করে আমাকে চেয়ে নাও। তোমার কাছে আমি এই বিষ্ণুপুরেই থাকব।

মদনমোহন তারপর ধরণীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—বাবা, আমার জন্য মহারাজ বীর হাম্বির কী না করেছে? চুরি করেছে, মিথ্যে কথা বলেছে, সুনাম-দুর্নামের দিকে বিন্দুমাত্র নজর দেয়নি। এমন ভক্তকে আমি ছেড়ে যেতে পারব না, আমাকে বিষ্ণুপুরেই থেকে যেতে হবে। আপনি বৃষভানুপুরে ফিরে যান। সেখানে রাধা আছেন। রাধা আর আমি কি আলাদা? রাধার সেবা করলেই আমার সেবা করা হবে।

ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসলেন ধরণী। সর্বস্বান্তের মতো বসে রইলেন।

বীর হাম্বির সকালবেলা ধরণীকে নিয়ে গেলেন লক্ষ্মীঘরে। মদনমোহনের মূর্তি দেখে ধরণী কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—এই তো আমার মদনমোহন।

বীর হাম্বির তারপর ধরণীকে বললেন—ঠাকুরমশাই, মদনমোহনের বাঁদিকে রাধা থাকলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। মদনমোহন কৃপা করে এসেছেন। আপনি দয়া করে রাধাকেও এনে দিন। যত মোহর

চান দেব।

ধরণী মোহরের কথা কানেও নিলেন না। বললেন -মহারাজ, মদনমোহনকে নিয়েও সাধ মিটল না? রাধাকেও চাইছেন?

বীর হাম্বির থালাভর্তি মোহর এনে রাখলেন ধরণীর পায়ের কাছে।

ধরণী পা দিয়ে ঠেলে ফেললেন মোহরের থালা। তুচ্ছ মোহর দিয়ে কী হবে?

—মদনমোহন, লোকে বলে, তোমার দয়ার অন্ত নেই। কিন্তু আমার মতে তুমি নির্দয়, শঠ, অকৃতজ্ঞ। তুমি ছিলে আমার সর্বস্ব। বিষ্ণুপুরের টানে তুমি আমার সর্বনাশ করলে। --শেষপর্যন্ত ধরণী অভিশাপ দিলেন মদনমোহন, বিষ্ণুপুরের জন্য তুমি বৃষভানুপুর ছাড়লে বটে, কিন্তু একদিন তোমাকেও চিরকালের জন্য এই বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কাঁদতে-কাঁদতে ধরণী চলে গেলেন বৃষভানুপুরে। মদনমোহন বিষ্ণুপুরে থেকে গেলেন।

বীর হাম্বিরের মৃত্যুর বহুকাল পর বিষ্ণুপুরের রাজা হয়েছেন চৈতন্যসিংহ —বীর হাম্বিরের একজন বংশধর। দুরবস্থায় পড়ে চৈতন্যসিংহ বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের কাছে মদনমোহনকে বন্ধক রেখে লাখখানেক টাকা নিয়েছেন। টাকা শোধ দিয়ে চৈতন্য-সিংহ মূর্তি ফেরত নিতে পারেননি; শেষপর্যন্ত মদনমোহনকে তিনি গোকুলচন্দ্রের কাছে বিক্রি করে দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বিষ্ণুপুরে ফিরে গেছেন।

গোকুলচন্দ্র ঘোর নিষ্ঠাবান ও সাধু বৈষ্ণব; মনেপ্রাণে তিনি মদনমোহনের সেবাপুজো করেছেন। গোকুলচন্দ্র এমন ব্যবস্থা করে গিয়েছেন যেন তাঁর মৃত্যুর পরেও মদনমোহনের সেবাপুজোর জন্য কোনোদিন টাকার অভাব না হয়।

মদনমোহন আর বিষ্ণুপুরে ফিরে যাননি। বৃষভানুপুরের ধরণীর

বহুকাল আগের অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে মদনমোহনের স্বভাবে বিষ্ণুপুরে হাহাকার পড়ে গেছে। এ-বিষয়ে একটি কবিতা পর্যন্ত রচিত হয়েছে; কবিতাটি থেকে সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি :

"বাগবাজারে মদনমোহন রহিলেন ব'সে।
বিষ্ণুপুরের শ্রীমন্দিরে পাথর পড়ে খ'সে॥
রাজা কাঁদে, রাণী কাঁদে, কাঁদে প্রজাগণ।
পূজারি ব্রাহ্মণ কাঁদে হ'য়ে অচেতন॥
হাতিশালে হাতি কাঁদে, ঘোড়া না খায় পানি।
বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে চৈতন্যের রাণী॥"

আবার বীর হাম্বিরের কথায় ফিরে যাই।

বীর হাম্বির, শোনা যায়, ১৬১৬ সালে বৃন্দাবনে মারা গেছেন। কিন্তু আজও তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁব এই অমরত্বের মূলে আছে সম্ভবত কয়েকখানা পুঁথি—মহামূল্যবান রত্ন।

গুরুমা

পেদ্রো তাভারেস নামে একজন পোর্তুগিজ ব্যবসায়ী আগ্রায় এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আছে একদল পোর্তুগিজ নাবিক। অনেককাল আগের কথা। আকবর তখন ভারতবর্ষের সম্রাট।

ওঁদের সঙ্গে সম্রাট আকবরের কথাবার্তা হল আগ্রার রাজসভায়। সম্রাট আকবর সন্তুষ্ট হলেন; বঙ্গদেশে একটি শহর নির্মাণের জন্য পোর্তুগিজদের অনুমতি দিলেন।

গঙ্গাতীরে একটি নতুন শহরের পত্তন করলেন পোর্তুগিজেরা।

নতুন শহরের নাম দিলেন—উগোলিম। এই নাম আস্তে-আস্তে লোকের মুখে বদলে গিয়ে হল—হুগলি। কিছুকালের মধ্যে হুগলি হয়ে উঠল সুন্দর, সম্পন্ন, সেরা বাণিজ্যকেন্দ্র।

হুগলি শহরের উত্তরে ব্যাণ্ডেল নামে একটি গ্রাম। ব্যাণ্ডেলে একটি গির্জা গড়ে উঠল। ১৫৯৯ সালের কথা। এই গির্জায় স্থাপিত হয়েছে মা মারীয়ার মূর্তি। এই মূর্তিকে বলা হয়—শুভময়ী সমুদ্রযাত্রার মা।

কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষজনের কাছে এই মূর্তির আরেকটি নাম আছে—গুরুমা।

ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ সব সময়েই এই মূর্তির বেদীমূলে বসে প্রার্থনা করতেন। ফাদার যোয়াম দা ক্রুশের একজন অন্তরঙ্গ পোর্তুগিজ

বন্ধুও ওই মূর্তির পরম ভক্ত। এই অন্তরঙ্গ পোর্তুগিজ বন্ধুর নাম কী? আজ পর্যন্ত জানা যায়নি।

আকবরের পর ভারতবর্ষের সম্রাট হলেন জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীরের পর শাহাজাহান।

পোর্তুগিজদের উপর সম্রাট শাহাজাহান বিন্দুমাত্র তুষ্ট নন। পোর্তুগিজদের বিরুদ্ধে তাঁর বিস্তর অভিযোগ।

সম্রাট শাহাজাহানের হুকুমে বাঙলার নবাব কাশিম খাঁ, ১৬৩২ সালের ২৪ জুন, ব্যাণ্ডেল আক্রমণ করলেন। মেল্লো নামে একজন বিশ্বাসঘাতক পোর্তুগিজ মোগলদের সাহায্য করেছে।

হুগলির দক্ষিণে গঙ্গায় প্রায় পাঁচশ মোগল জাহাজ, উত্তর দিক থেকে স্থলপথে আক্রমণ করলেন স্বয়ং নবাব, সঙ্গে বিস্তর সৈন্য।

মাত্র হাজারখানেক সৈন্য নিয়ে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন পোর্তুগিজ সেনাপতি মনোয়েল আজেভেদো। গির্জার ছাদ থেকে ছোড়া হয়েছে পোর্তুগিজ কামানের গোলা।

ব্যাণ্ডেল ও উত্তর দিকের পোর্তুগিজ অঞ্চল, ১৬৩২ সালের ৩১ জুলাই, চলে গেল মোগলদের দখলে। আক্রান্ত হল হুগলি।

দিনের পর দিন যুদ্ধ চলল। মোগল সেনাপতি সাব্যস্ত করলেন যে সামনাসামনি যুদ্ধে পোর্তুগিজদের হারানো সম্ভব নয়। অন্য উপায় দরকার।

১৬৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। ভক্তেরা উপাসনা করছেন। সেই সময়ে মোগল সৈন্যেরা গোপনে দুর্গে ঢুকে পড়ল। একজন বিশ্বাসঘাতক পোর্তুগিজ মোগলদের সাহায্য করেছে। দুর্গে ঢুকে মোগলেরা প্রথমেই পোর্তুগিজদের অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিল। বহু পোর্তুগিজকে সেদিন মোগল সৈন্যদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

হুগলিতে, ১৬৩২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, আগুন, আগুন, কেবল

আগুন ; অনেক পোর্তুগিজ মহিলা সেদিন আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন।

কিন্তু এই যুদ্ধের কথা আর থাক।

তবু, প্রশ্ন থেকে যায়, ব্যাণ্ডেল গির্জায় স্থাপিত মা মারীয়ার মূর্তি কি এই যুদ্ধে নিস্তার পেয়েছিল ? এখানে ওই মূর্তির পরম ভক্ত ফাদার যোয়াম দা ক্রুশের সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথা মনে আনতে হবে। যুদ্ধে যখন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন ওই পরম ভক্ত মা মারীয়ার মূর্তিকে বাঁচানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। অন্য কোনো উপায় নেই দেখে তিনি মূর্তিটিকে বুকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।

তারপর কোথাও কোনোদিন এই পরম ভক্তের আর দেখা পাওয়া যায়নি

প্রায় চার হাজার পোর্তুগিজ বন্দী হলেন।

বন্দী পোর্তুগিজদের আগ্রায় নিয়ে আসা হল ১৬৩৩ সালের জুলাই মাসে চারশ জ্যান্ত বন্দী। বাকি বন্দীরা পথেই মারা গেছেন।

এই চারশ জ্যান্ত বন্দীর মধ্যে একজনের নাম ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ।

বৃদ্ধ বলে ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ রেহাই পেলেন না। আরম্ভ হল চূড়ান্ত অত্যাচারের পালা। কিন্তু হাসিমুখে প্রভু যিশুর নাম নিয়ে সব অত্যাচার তিনি সহ্য করে গেলেন। বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তারপর সম্রাট শাহাজাহানের হুকুমে তীব্র বিষাক্ত খাবার দেওয়া হল ফাদার যোয়াম দা ক্রুশকে।

সব বুঝতে পারলেন ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ, প্রভু শিশুর নাম নিয়ে তিনি ওই তীব্র বিষাক্ত খাবার খেয়ে ফেললেন। তীব্র বিষ নিষ্ফল হয়ে গেল। ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ বেঁচে রইলেন।

তীব্র বিষে কাজ হল না ? সম্রাট শাহজাহান সাব্যস্ত করলেন,

এবার ফাদার যোয়াম দা ক্রুশকে ফেলে দেওয়া হবে খেপা হাতি পায়ের তলায়।

খবর ছড়িয়ে গেল।

১৬৩৩ সালেব শীতকালের একটি সকাল।

প্রাঙ্গনের চতুর্দিকে বিস্তর লোক জমায়েত হয়েছে। একদিকে উচ্চাসনে বসে আছেন স্বয়ং সম্রাট শাহাজাহান। প্রাঙ্গনের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ আর তাঁর কয়েকজন সঙ্গী।

অদূরে বড় একটা লোহার খাঁচা। খাঁচার মধ্যে একটা মস্ত হাতি সাতদিনের উপোসী। পেটের জ্বালায় হাতি পাগল হয়ে উঠেছে।

সম্রাট শাহাজাহানের আদেশে খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া হল।

খেপা হাতি ছুটে গেল ফাদার যোয়াস দা ক্রুশের দিকে।

কিন্তু ফাদার যোয়াম দা ক্রুশের সামনে এসে থেমে গেল আস্তে আস্তে শান্ত হল, শুঁড় তুলে প্রণাম জানাল। তারপর নিজের পিঠের উপর তুলে নিল ফাদার যোয়াম দা ক্রুশকে, এগিয়ে গেল সম্রাট শাহাজাহানের দিকে।

জনতা জয়ধ্বনি দিল, চীৎকার করে উঠল—এই সন্ন্যাসী ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত, এঁর অনিষ্ট করলে দেশের সর্বনাশ হবে।

সম্রাট শাহাজাহান তখনই মুক্তি দিলেন ফাদার যোয়াম দা ক্রুশকে।

হাতিও ফাদার যোয়াম দা ক্রুশকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিল, শুঁড় তুলে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল।

সম্রাট শাহাজাহানের কাছে ফাদার যোয়াম দা ক্রুশের কি কোনো ধনদৌলতের প্রার্থনা আছে? না কিছু না। তিনি শুধু চান ব্যাণ্ডেলে ফিরে যেতে, বাকি জীবন ঈশ্বরের সেবা ও উপাসনায় কাটিয়ে দিতে।

সম্রাট শাহজাহান আদেশ দিলেন যেন সসম্মানে ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ আর তাঁর সঙ্গীদের ব্যাণ্ডেলে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। এখানেই

শেষ হল না। সম্রাট শাহাজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি দান করে দিলেন। এই জমিতেই দাড়িয়ে আছে ব্যাণ্ডেল গির্জা।

ব্যাণ্ডেলে ফিরে এলেন ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ।

ব্যাণ্ডেল গির্জার কম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মেরামত দরকার। নানা জায়গা থেকে সাহায্য এল।

সব সময়ে ফাদার যোয়াম দা ক্রুশের মনে পড়ে মা মারীয়ার মূর্তির কথা আর তাঁর অন্তরঙ্গ পরম ভক্ত বন্ধুর কথা। মা মারীয়ার মূর্তি আর সেই অন্তরঙ্গ পরম ভক্ত বন্ধু কোন অতলে তলিয়ে গেছে কে জানে। গভীর রাত্রে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। গির্জা মেরামতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে একদিন রাত্রে শোনা গেল গঙ্গার বিপুল গর্জন, দেখা গেল গঙ্গার দারুণ ঘূর্ণিজল।

ফাদার যোয়াম দা ক্রুশের ঘুম ভেঙে গেল। আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নেই, জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু গঙ্গা এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কেন? দু-হাত জোড় করে বৃদ্ধ ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ প্রভু যিশুর নাম স্মরণ করতে লাগলেন।

আস্তে-আস্তে গঙ্গার গর্জন কমে এল। যেন বহুদূর থেকে শোনা গেল পরম ভক্ত নিকদেশ বন্ধুর গলা—এসো, এসো, হে আমাদের শুভ যাত্রার মা মরীয়া, তোমাকে অভিনন্দন জানাই, তুমি আমাদের বিজয়ী করেছ। ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ, উঠুন উঠুন, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

নিজের ঘর থেকে বিহ্বল বৃদ্ধ ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ দেখলেন গঙ্গায় উজ্জ্বল আলো, ওই আলোর পথ ধরে কে যেন এগিয়ে আসছে। হঠাৎ আলো নিভে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে আবার বেড়ে উঠল গঙ্গার গর্জন।

পরদিন ভোরে গির্জার সামনে গঙ্গাতীরে লোকের ভিড়। চীৎক শোনা গেল—গুরুমা আবার ফিরে এসেছেন।

খবর পেয়ে চলে এলেন ফাদার যোয়াম দা ক্রুশ। দেখলেন, সা দীর্ঘকাল বাদে মা মারীয়ার সেই মূর্তি ফিরে এসেছে। মূর্তির সাম নতজানু হলেন, ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন ম ভ বিলুপ্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করলেন।

শুভদিনে মহাসমারোহে মূর্তিটি গির্জায় নিয়ে আসা হয়েছে।

গির্জার চূড়ায় ওঠার জন্য সিঁড়ি বানানো হল। সাব্যস্ত হ একদিন বিশেষ উৎসব করে মূর্তিটি চূড়ায় স্থাপন করা হবে।

১৬৫৫ সালের গ্রীষ্মকালের একটি সকালবেলা। উৎসবের দি মূর্তিটি চূড়ায় স্থাপন করা হবে। দলে-দলে ভক্ত এসেছে। জয় মারীয়া। জয় গুরুমা।

হঠাৎ একখানা পোর্তুগিজ জাহাজ গির্জার ঘাটে এসে থামল।

জাহাজের কাপ্তেন বা আর কেউ জানতেন না যে এখানে এ গির্জা আছে। বঙ্গোপসাগরে দারুণ তুফানের মধ্যে পড়েছিল জাহাজ, নিস্তারের কোনো আশা ছিল না। কাপ্তেন তখন মা মারীয় কাছে আকুল হয়ে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, মা করেছিলেন যে রক্ষা পেলে পথের প্রথম গির্জায় জাহাজের এ মাস্তুল দান করে যাবেন।

বিশেষ একটি উৎসবের দিনে এই গির্জায় উপস্থিত হতে পেরে বলে জাহাজের সকলে আনন্দিত। কাপ্তেন একটি মাস্তুল করলেন। ফাদার যোয়াম দা ক্রুশের ইচ্ছায় মাস্তুলটি স্থাপিত গির্জার সামনে।

গুরুমায়ের সেই মূর্তিটি এখনও ব্যাণ্ডেলের গির্জায় জীবন্ত। সেই মাস্তুলটি এখনও আছে।

গোস্বামী-দুর্গাপুর

রাজা রায়মুকুটের রাজধানীর নাম জয়দিয়া।

জয়দিয়া থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে বনজঙ্গল; জীবজন্তুর অভাব নেই সেখানে। এই বনজঙ্গল রাজা রায়মুকুটের রাজ্যের অন্তর্গত।

একদা বসন্তকালে রাজা রায়মুকুট শিকারের জন্য চললেন ওই বনজঙ্গলে। সঙ্গে চললেন রানী চম্পাবতী আর কন্যা দুর্গাবতী। তা ছাড়া বিস্তর লোকজন আর অনেক হাতিঘোড়া তো আছেই।

দুর্গাবতী ছাড়া রাজারানীর আর কোনও সন্তান নেই। দুর্গাবতী রমা সুন্দরী।

কুমার নদের পশ্চিমদিকে বনজঙ্গলে রাজার হুকুমে তাঁবু পড়ল।

পরদিন রাজা রায়মুকুট নিজের প্রিয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে চললেন শিকারে; বাঁদিকে ঢাল, ডানদিকে তলোয়ার। রাজার সঙ্গে-সঙ্গে লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলেছে পঁচিশটা ঘোড়া আর পাঁচটা হাতি।

হঠাৎ রাজা রায়মুকুটের চোখে পড়ল একটি হরিণ। হরিণ ছুটে পালাল। হরিণের পিছে-পিছে রাজাও ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। হরিণ প্রাণভয়ে কখনও এদিকে কখনও ওদিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল—যেন মাটিতে পা পড়ছে না, উড়ে যাচ্ছে। হরিণ শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে

গেল ঘন জঙ্গলের মধ্যে। অত ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়ার যাওয়ার সাধ্য নেই।

ক্লান্ত হয়ে রাজা রায়মুকুট ঘোড়া থেকে নামলেন। সঙ্গীরা পিছনে কে কোথায় পড়ে আছে কে জানে।

ঘোড়া বেঁধে রেখে রাজা রায়মুকুট একটা গাছতলায় বিশ্রাম করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে রাজা রায়মুকুট আবার ঘোড়ায় উঠলেন, সঙ্গীদের খোঁজে চললেন। যেতে-যেতে একটি চমৎকার জায়গা চোখে পড়ল। নানা গাছে বিস্তর ফুল ফুটে আছে, ফুলে-ফুলে অনেক মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাতাসে ফুলের গন্ধ, কত কোকিলের গলা ময়ূরী। হরিণের বাচ্চা। যেন পুরনো কালের তপোবন।

ঘন বনের মধ্যে এমন আশ্চর্য তপোবন!

আশ্চর্য হয়ে রাজা রায়মুকুট আরও এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, সামান্য একটি কুটিরের কাছে একজন অসামান্য তরুণ ধ্যানে মগ্ন। তাঁর গলায় তুলসীর মালা, পরনে গেরুয়া। তরুণ সন্ন্যাসীর রূপে বন যেন আলো হয়ে আছে।

রাজা রায়মুকুট ঘোড়া থেকে নামলেন। একটি গাছে ঘোড়া বেঁধে রেখে এগিয়ে চললেন কুটিরের দিকে। দেখলেন কুটিরের মধ্যে ত্রিভঙ্গ রাধারমণের চমৎকার মূর্তি। রাজা রায়মুকুট সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন রাধারমণকে। তারপর আবার এগিয়ে চললেন।

রাজার পায়ের শব্দে তরুণ সন্ন্যাসী চোখ মেলে তাকালেন কুশাসন পেতে দিলেন। কুশাসনে বসে রাজা রায়মুকুট বললেন- আপনাকে এখানে একা দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি। চারপাঁ ক্রোশের মধ্যে কোথাও লোকালয় নেই, এই জঙ্গলে বিস্তর হিংস্র জ থাকে। এত অল্প বয়সে আপনি কোন সাহসে এখানে থাকেন আপনার নাম কী, বাড়ি কোথায়? আপনার রাধারমণের মূর্তি চমৎকার, এত চমৎকার মূর্তি আমি কোনও বড়মানুষের বাড়িতে

দেখিনি।

তরুণ সন্ন্যাসী বিনীতভাবে বললেন—নিজের বিষয়ে যতদূর বলতে বাধা নেই আমি আপনাকে ততদূর বলতে পারি। আমার নাম শ্রীকমলা কান্ত গোস্বামী, আমি বন্দ্যবংশের সন্তান। ইষ্টদেবতার উপাসনার জন্য সংসার ছেড়ে বনে এসেছি। একদা একদল তৃষ্ণার্ত দস্যুকে জল দিয়েছি, তাদের কাছ থেকে এই রাধারমণজীকে পেয়েছি। আপনার পায়ের ধূলোয় আজ আমার কুটির পবিত্র হল। যদি বলতে দোষ না থাকে তো বলতে আজ্ঞা হয়—আপনি কে?

রাজা বললেন—আমার নাম শ্রীরায়মুকুট শর্মা।

তরুণ সন্ন্যাসী বললেন- মহারাজের আর কিছু বলার দরকার নেই। আমি মহারাজের নাম শুনেছি। আপনার সঙ্গে দেখা হল, আজ আমার জীবন সার্থক। এই ঘোর অরণ্যে আপনি কেন এসেছেন।

রাজা রায়মুকুট উত্তর দিলেন- আমি এসেছি শিকার করতে। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে যেতে হবে, এখন বিদায় নিচ্ছি। যদি পারি, পরে দেখা করব।

রাধারমণকে প্রণাম করে রাজা রায়মুকুট চলে গেলেন।

পরদিন তিনি রানী ও রাজকন্যাকে নিয়ে তরুণ সন্ন্যাসীকে দর্শন করে এলেন। তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সকলেই মুগ্ধ।

তারপব রাজা বায়মুকুট সকলকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

রাজকন্যার বিবাহের কথা হচ্ছে। কিন্তু কী বিপত্তি! রানী একদিন রাত্রে রাজাকে বললেন—দুর্গা ওই বনের সন্ন্যাসীকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করবে না।

রাজা রাগ করে বললেন—আমি কি বনের সন্ন্যাসীর সঙ্গে দুর্গার বিবাহ দেব? কে ওই সন্ন্যাসীর কুলশীল জানে? যত অসম্ভব কথা!

কথাটা দুর্গাবতীর অজানা রইল না। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অসুখ হল। এমন অসুখ যেন তার প্রাণ যায়। ঘোর বিকার। কিন্তু বিকারের মুখেও ওই সন্ন্যাসীর কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা নেই।

গল্পে আছে, রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহের জন্য জীবনপণ করেছে রাজকন্যা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিবাহের জন্য জীবনপণ করেছে রাজকন্যা— এমন কথা বুঝি গল্পেও পাওয়া যায় না।

গল্পের বাইরেও সংসারে ঘটনা ঘটে।

রাজা রায়মুকুট অগত্যা রানীকে বললেন—যদি দুর্গা ভালো হয়ে যায় তাহলে ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গেই বিবাহ দেব। আগে আমি বুঝতে পারিনি···

রানী সজলচোখে বললেন—এখন যে বুঝতে পারলে তাও সুখের কথা।

চিকিৎসার ফলে দুর্গাবতীর যখন কিঞ্চিৎ চৈতন্য হল তখন সে শুনতে পেল যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার বিবাহ দিতে রাজা রাজী হয়েছেন।

দিনকয়েকের মধ্যে দুর্গার অসুখ সেরে গেল। কিন্তু শরীর দুর্বল রইল। অসুখ সারলেই শরীর সঙ্গে সঙ্গে আগের মতো সবল হয়ে ওঠে না।

কিন্তু সন্ন্যাসী কি রাজী হবেন ?

স্বপ্নে ইষ্টদেবতার আদেশ পেয়ে সন্ন্যাসী বনবাসী হয়েছেন ; এবং ইষ্টদেবতার আদেশে চিরদিন সন্ন্যাসীকে ওখানেই বাস করতে হবে। ইষ্টদেবতার আদেশ অমান্য করা চলে না।

গোড়ার দিকে সন্ন্যাসী বিবাহ করতে রাজী হননি। অনেক কথাবার্তার পর সন্ন্যাসী একদিন রাজমন্ত্রী ব্রজসুন্দর রায়কে বললেন— যদি বিবাহের পর আমাকে ও রাজকন্যাকে এই বনে বাস করতে দিতে মহারাজের আপত্তি না থাকে তাহলে আমি এই বিবাহ করতে পারি।

ব্রজসুন্দর বললেন—বোধ করি রাজার এ-বিষয়ে আপত্তি হবে না।

যদি আপনার এ-কথায় রাজা আপত্তি না করেন তাহলে আপনি বিবাহ করতে রাজী আছেন তো ?

সন্ন্যাসী বললেন—হ্যাঁ রাজী আছি।

রাজধানীতে ধুমধাম পড়ে গেল। কিছুদিন পর সন্ন্যাসীকে নিয়ে আসা হল রাজধানীতে। ব্রজসুন্দর অভ্যর্থনা করে সন্ন্যাসীকে নিয়ে এলেন রাজবাড়িতে। সন্ন্যাসীর আসল নাম, ভুলে গেলে চলবে না, কমলাকান্ত গোস্বামী।

কমলাকান্ত সন্ন্যাসী হয়েছেন কেন ? সেসব কথা বলতে কি আপত্তি আছে ?

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রাজা রায়মুকুটের দিকে তাকিয়ে কমলাকান্ত বললেন—মহারাজ, যদি আজ্ঞা হয়, নিজের কথা আগাগোড়া বলি। যখন সংসারী হতে যাচ্ছি তখন আর পুরনো কথা গোপন রাখার দরকার নেই।

ব্রজসুন্দর বললেন—যদি বক্তার বলতে আপত্তি না থাকে তাহলে শ্রোতাদের শুনতে বাধা কী ?

রাজা রায়মুকুট বললেন—এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছ কেন, জানতে ইচ্ছে করে বইকি।

কমলাকান্ত বললেন—মহারাজ, যশোহরের বিখ্যাত কালীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতা।

শুনে রাজা রায়মুকুট চমকে উঠলেন।

ব্রজসুন্দর অবাক হয়ে বললেন—কী আশ্চর্য !

রাজা রায়মুকুট বললেন—দুর্গাবতীর কী সৌভাগ্য ! বৎস, তুমি খুব মহৎ বংশের সন্তান। কেমন করে তোমার এ-দশা হল ? একুশ বছর তোমার বাবার কোনও সংবাদ শুনিনি। হঠাৎ তিনি উধাও হয়ে গিয়েছেন, কেন গিয়েছেন, কোথায় গিয়েছেন—সবই অজানা। কেউ কিছু বলতে পারেনি। তুমি বলতে পারো ?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কমলাকান্ত বললেন—সেসব কথা যাদের জানা তাদের মধ্যে এখন আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।

কমলাকান্তের মুখ থেকে আস্তে-আস্তে পুরনো কথা শোনা গেল।

রাজা বসন্ত রায়, সকলেই জানে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুড়ো। মহারাজ প্রতাপাদিত্যই, কারও অজানা নেই, রাজা বসন্ত রায়কে হত্যা করেছিলেন।

কালীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাজা বসন্ত রায়ের পক্ষে। কালীকান্তের ঐশ্বর্য ও মর্যাদা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চক্ষুশূল। কালীকান্ত জানতে পারলেন যে মহারাজ প্রত্যাপাদিত্য তাঁকেও সমূলে বিনাশ করার জন্য লোক লাগিয়েছেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই। যদি বাঁচতে হয় তাহলে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব থেকে পালিয়ে যাওয়াই একমাত্র উপায়।

কালীকান্তের স্ত্রীর ভাইয়ের নাম দীনবন্ধু। কালীকান্ত, তাঁর স্ত্রী ও দীনবন্ধু একদিন রাত্রে তীর্থযাত্রীর সাজে পালিয়ে গেলেন। বড় দুর্যোগের রাত্রি। আকাশে ঘন মেঘ। প্রবল বাতাস। অল্প-অল্প বৃষ্টি। গাঢ় অন্ধকার।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভয়ে কালীকান্তকে আপন জন্মভূমি ছেড়ে গোপনে চলে যেতে হচ্ছে। কোথায় আশ্রয় পাওয়া যাবে কে জানে।

সারারাত হেঁটে প্রায় ছ-ক্রোশ রাস্তা পার হলেন তিনজনে। সকালবেলা একটি গ্রামের গাছতলায় বিশ্রাম নিতে বসেন।

কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করেছেন—আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? কোথায় যাবেন?

দীনবন্ধু উত্তর দিয়েছেন—আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। চিনতে পারবেন না। আমরা কাশীধামে যাচ্ছি।

কালীকান্তের স্ত্রীর আর হাঁটার শক্তি নেই। অগত্যা তাঁর জন্য একখানা পালকি ভাড়া করতে হল। কালীকান্ত ও দীনবন্ধু হেঁটে চললেন।

প্রায় সাত ক্রোশ পথ পেরিয়ে একটি নদী। একখানা নৌকোও পাওয়া গেল। তিনজনে নৌকোয় উঠলেন। একদিন পর শিবপুরে এসে পৌঁছলেন। জায়গাটি পছন্দ হল। সেখানেই তিনজনে আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে যা কিছু ছিল বিক্রি করে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে লাগলেন।

কিছুদিন পর কমলাকান্তের জন্ম হল।

কমলাকান্তের বয়স এক বছর হতে-না-হতেই বাবা মারা গেলেন। তারপর কমলাকান্তের মা আর কিছুতেই শিবপুরে থাকতে চাইলেন না। তা ছাড়া শিবপুরে তখন ফিরিঙ্গিদের দৌরাত্ম্যও আরম্ভ হয়েছে।

আবার আস্তানা বদল করতে হল। শিবপুর ছেড়ে নলডাঙায়।

দীনবন্ধু সংস্কৃতে পণ্ডিত রাজসভায় তাঁর প্রতিপত্তি হয়েছে। অনেক ছাত্রও তাঁর কাছে পড়াশোনা করতে এসেছে। অতএব সংসারে খাওয়া-পরার অভাব রইল না।

মা মারা গেলেন। কমলাকান্তের বয়স তখনও পাঁচ বছর হয়নি।

বাবা নেই, মা নেই, কিন্তু মামা আছেন। দীনবন্ধু পরম যত্নে লেখাপড়া শিখিয়ে কমলাকান্তকে বড় করে তুলেছেন।

কমলাকান্তের বয়স তখন ষোলো বছর। দীনবন্ধু একদিন কমলাকান্তকে ডেকে বললেন—আমি সাব্যস্ত করেছি, রথযাত্রা দেখতে পুরী যাব। তুমি এখানেই থাকো।

—না, আমি এখানে থাকব না। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

দীনবন্ধু বললেন—পথ বড় দুর্গম।

কিন্তু কমলাকান্ত নাছোড়। অগত্যা কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে দীনবন্ধু রওনা হলেন। পথের কষ্ট বর্ণনা না করাই ভালো—চূড়ান্ত

কষ্ট।

পুরীধাম। রথ হয়ে গেল। উল্টোরথও শেষ। মাসখানেক পর দীনবন্ধু পড়লেন অসুখে। দিনে-দিনে অসুখ বাড়তে লাগল।

দীনবন্ধু একদিন কমলাকান্তকে ডেকে বললেন—কমলাকান্ত, সর্বদা ধর্মপথে থাকবে। ধর্ম ছাড়া চিরসঙ্গী কিছু না, কেউ না। অর্থ বলো, পদ বলো, আত্মীয় বলো—সবই দুদিনের জন্য। আমি তো পরলোকে চললাম। আমার উপদেশগুলি যেন মনে থাকে।

পরদিন দীনবন্ধু মারা গেলেন।

কমলাকান্ত কেঁদে আকুল। সংসারে কোথাও তার আর কেউ রইল না। সে কোথায় যাবে, কি করবে?

পুরীর একজন সন্ন্যাসী শান্ত করে তুললেন কমলাকান্তকে। তিনিই কমলাকান্তকে দীক্ষা দিলেন।

তারপর কমলাকান্ত প্রায় চার বছর বাস করেছেন খণ্ডগিরির একটি গুহায়। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি ফিরে এসেছেন—কিছুদিন যশোহরে থেকেছেন। আবার স্বপ্নাদেশ পেয়ে কুমার নদের তীরের জঙ্গলে আশ্রম করেছেন। রাজা রায়মুকুট সেখানেই কমলাকান্তকে প্রথম দেখছেন।

পুরনো কথা এই পর্যন্ত।

তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে কমলাকান্ত গোস্বামীর সঙ্গে দুর্গাবতীর বিবাহ হয়ে গেল।

রাজা রায়মুকুটের আদেশে কমলাকান্ত গোস্বামীর আশ্রমের চতুর্দিকের বনজঙ্গল নিশ্চিহ্ন হল। নতুন গ্রাম গড়ে উঠল সেখানে। কমলাকান্ত গোস্বামী ও দুর্গাবতীর নামে নতুন গ্রামের নাম হল—গোস্বামী-দুর্গাপুর।

নদীয়ার ইতিহাসে 'গোস্বামী-দুর্গাপুরে'র নাম আছে।

সমাপ্ত